চণ্ডীদাস

চণ্ডীদাস

উত্তর-রাঢ়ের উত্তর-পশ্চিম কোণে বীরভূমি, বাঙ্গালার একেবারে সীমানায়। বীরভূমের পশ্চিমে আর বাঙ্গালা নাই। মুসলমানদের বাঙ্গালায় আসিবার ২০০ শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বীরভূমের ইতিহাস ও বীরভূমের ধর্ম্ম বিষয়ে যাহা কিছু জানা যায়, তাহার একটু আলোচনা হওয়া আবশ্যক। এই ২০০ শত বৎসরের মধ্যে বীরভূমে মহীপাল নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার নামে প্রকাণ্ড এক দীঘি আর প্রকাণ্ড একটি ঢিবি এখনও বর্ত্তমান আছে; সেই স্থানটির নামও মহীপাল। কাঞ্চী নগরের রাজেন্দ্র চোল এই মহীপালকেই পরাস্ত করিয়া উত্তররাঢ় লুঠ করিয়াছিলেন। ইহার পর, বীরভূম জেলার মধ্যে পাইকোড় গ্রামে নারায়ণ-চত্বরে একখানি শিলালিপিতে লেখা আছে যে, কর্ণচেদি এই দেশ দখল করিয়াছিলেন ও এখানে কিছু দিন রাজত্বও করিয়াছিলেন। কর্ণচেদি ১০৪২ খ্রীঃ অব্দে রাজা হন। তাঁহার রাজধানী নর্ম্মদা নদীর ধারে ত্রিপুরী নগরে ছিল। সেইখান হইতে তাঁহার পিতা ও তিনি চারি দিকে রাজ্য জয় করিতে করিতে এক প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য করিয়াছিলেন; উত্তরে হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্ব্বত পর্য্যন্ত, পূর্ব্বে বাঙ্গালা হইতে পশ্চিমে দিল্লী পর্য্যন্ত তিনি সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। কিন্তু তিনি বরেন্দ্র-ভূমিতে বিগ্রহপালের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হন; বিগ্রহপালকে কন্যা দান করেন। তিনি পাহি দত্তকে বীরভূমির সামন্ত-রাজা করিয়া দেন। পাহি দত্তও নিজের নামে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন ও নিজের নামে তাহার নাম রাখেন পাহিকোট্ট বা পাইকোঁড়।

ঐ নারায়ণচত্বরে কর্ণচেদির শিলালিপির পাশেই বিজয়সেনের এক শিলালিপি পাওয়া যায়। সেনবংশ উত্তররাঢ় হইতেই আপনাদের রাজ্য বিস্তার করেন।

যত বার নূতন রাজা আসিয়াছেন, তত বারই বীরভূমে নূতন নূতন ধর্ম্ম হইয়াছে। মহীপালের আগে প্রায় সবই বৌদ্ধ ছিল। কিন্তু তখনকার বৌদ্ধ হীনযানও ছিল না, মহাযানও ছিল না; সবই সহজযান হইয়া গিয়াছিল। সহজযানের দুই রূপ আছে;—এক ভৈরব-ভৈরবী, আর এক নাঢ়ানাঢ়ী। প্রথমটি শাক্ত হইয়া দাঁড়ায়, দ্বিতীয়টি বৈষ্ণব হইয়া দাঁড়ায়। কথা দুইয়েরই এক—যুগনদ্ধ বা যুগলরূপের উপাসনা। কেহ তাহার সঙ্গে মাছ-মাংস খান, কেহ বা খান না।

নানারূপ ধর্ম্মের মধ্যে বীরভূমে এক নূতন সহজিয়া ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার নাম কি বলিব, জানি না; তবে মোটামুটি বলা যায়, কঙ্কালিনীর উপাসনা। ভারতবর্ষের ২৪ জায়গায় কঙ্কালিনীর উপাসনা হইত; বীরভূমের অট্টহাসই তাহার প্রথম জায়গা। এখানে তাঁহার মন্দির ছিল না, তিনি এক কদম্ব-তলায় থাকিতেন। অট্টহাসের এই মূর্ত্তি এখন সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে আছে। তাঁহার পাঁজরাগুলি সব গণা যাইতেছে; কেবল যেন চামড়া দিয়া ঢাকা; পেটটি খোলে পড়িয়া গিয়াছে; চক্ষু কোটরগত। তিনি উৎকুটুকাসনে

বসিয়া আছেন অর্থাৎ পায়ের গুলমুড়া ছুটি যোড় করিয়া, পাছার নীচে দিয়া বসিয়া আছেন। তিনি কাসিতেছেন, কাসির ভাবটি বেশ দেখা যাইতেছে, কিন্তু তাহার মধ্যেও বেশ আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে। তাঁহার আকার-প্রকার দেখিলে, তিনি যে সহজযানের দেবতা, তাহা বেশ বুঝা যায়। কারণ, তাঁহার নিকটেই এক প্রকাণ্ড মুখওয়ালা ক্ষেত্রপাল থাকেন। আমরা ডাকার্ণব তন্ত্র হইতে অট্টহাসের কঙ্কালিনীর কথা তুলিয়া দিতেছি।

অথ কঙ্কালযোগেন দেশে দেশে স্বযোনিজম্।
জ্ঞানযুক্তা বিজানীয়াদ্যোগিনী বীরনায়িকা॥
অট্টহাসে চ যা (রজা) দেবী নায়কী সর্ব্বযোগিনী।
তস্মিন্ স্থানে স্থিতা দেবী মহাঘণ্টা কদম্বক্রমে॥
তস্য দেবী সদাবীরক্ষেত্রপালো মহাননঃ।
কঙ্কালসুখমায়া সা সম্ভবন্তি মহাত্মনাং॥
মুদ্রণং তেষু কঙ্কালমোড্ডানরন্ধ্রতোদ্গতং।
স্বধাতুক্ষিতবিজ্ঞানং সর্ব্বদেশগতং ক্রমাৎ॥

এই ধর্ম্ম ভারতবর্ষের যে ২৪টি জায়গায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সে নামগুলি সবই পুরান নাম। অনেকগুলি এখনও ঠিক করা যায় নাই।

কর্ণচেদির আসার পর হইতেই ইহাঁরা হিন্দু হইতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সেও একটু অদ্ভুত রকম। তখন নাথেরা খুব প্রবল। সুতরাং এক দল শৈব হন; কিন্তু শৈব হইলেও গাজনে তুলসীর মঞ্জরী দিয়া থাকেন। আর এক দল বৈষ্ণব হন, কিন্তু মাছ-মাংস দিয়া বালগোপালের ভোগ দেন। এই সকল সহজিয়া হিন্দুদের সর্ব্বপ্রধান জয়দেব ঠাকুর। রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তি তিনি উপাসনা করেন, সে উপাসনা সহজভাবেই ভোর। যে সহজ-ভাব বৌদ্ধ বোধিসত্ত্বেরা নিজের বোধিচিত্তে অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইতেন, হিন্দু সহজিয়ারা সেই ভাবটি রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তিতে আরোপ করিয়া, তদ্দর্শনেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন। সহজভাব কেহ কাহাকেও বুঝাইতে পারেন না, নিজে যে বুঝিতে পারিল, সেই বুঝিতে পারিল, নহিলে বুঝাইবার যো নাই। কাহ্নুপাদ বলিয়া গিয়াছেন,—

"গুরু বোধসে সীসা কাল"—অর্থাৎ গুরু যখন বুঝাইয়া দেন, শিষ্য তখন কালা হইয়া যায়। তিনি আরও বলিয়াছেন,—

ভণই কাহ্নু জিণরয়ণ বিকসই সা।
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা॥

ইহার ব্যাখ্যা,—ভণই ইত্যাদি। কৃষ্ণাচার্য্যো হি বদতি কীদৃশং জিনরত্নং রত্তিং অনন্তমনুত্তরসুখং তনোতীতি রত্নং চতুর্থানন্দং বোদ্ধব্যং। যথা বধিরঃ সংকেতাদিনা মূকস্য সংবোধনং করোতি, তদ্বদ্দূরে সদ্গুরুঃ শিষ্যে রতিস্বপ্রভাবেন মহাসুখং তনোতি। তথাচ ইউড়ীপাদাঃ দূরে অদূরে বেত্যাদি।

সরহপাদ বলিতেছেন,—

সো পরমেস্থরু কাসু কহিজ্জই ।
সুরঅকুমারী জিমহু পড়িজ্জই ॥

অদ্বয়বজ্রের ব্যাখ্যা,—ভ্রান্ত্যা যাবৎ সন্তনিকায়ৈঃ স্থিতোঽপি সপরমতত্ত্বং পরমেশ্বরো অন্যসিদ্ধান্তাভাবাৎ। কস্য পৃথগ্‌জনাবস্থিতস্য কথয়ামি হি তৎ। কথনমাত্রেণ তেষু প্রবৃত্তিঃ। কিন্তর্হি। যথা কুমার্য্যঃ সখীভ্যামালোচয়ন্তি প্রত্যয়ং কুর্ব্বন্তি। প্রথমতঃ ত্বয়া স্বামিনে গত্বা সুরতসুখমনুভূতং তস্মিন্ সাক্ষাদ্দর্সি নিশ্চিতমেতৎ। গত্বা সা পুনরস্য গৃহাদাগত্য সখিনা চ পৃচ্ছতি পূর্ব্বোক্তং কীদৃশমিতি। তা উচুঃ। ত্বয়া সাক্ষাৎ স্বামিনা সহানুভবকালে জ্ঞেয়মিতি, সুখোৎপাদং ন কিঞ্চিৎ সাক্ষাৎ তে বক্তুমবাচ্যত্বাৎ।

আমরা জয়দেবের যে বইখানি পাই, তাহাতে তিনি যে বৈষ্ণব সহজিয়া ছিলেন, ইহাই বুঝিতে পারি। তিনি রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তিরই উপাসনা করিতেন। অন্যরূপ সহজিয়া ভাব তাঁহার কাব্যে নাই। কিন্তু বনমালা দাস তাঁহার যে চরিত লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ হয়, তিনি বা এক সময় খাঁটি সহজিয়া ছিলেন। তাঁহার জাতি-কুল কেহই জানিত না। তিনি কেন্দুলিতে থাকিতেন, কিন্তু কেন্দুলির কেহই তাঁহার জাতি-কুল জানিত না। যখন দক্ষিণ দেশ হইতে এক ব্রাহ্মণ জগন্নাথের এক দেবদাসীকে সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল ও জয়দেবের খোঁজ করিল, তখন সকলেই বলিল যে, জয়দেব বলিয়া একজন কদম্বখণ্ডীর ঘাটে থাকে বটে, কিন্তু তাহার জাতি-কুল কেহই জানে না। কিন্তু ব্রাহ্মণ ত জাতি-কুল খুঁজিতে আসে নাই, যদি খুঁজিত, নিজের দেশেই সে মেয়ের বিবাহ দিত। সে আসিয়াছে জগন্নাথের হুকুমে জয়দেবকে মেয়ে দিতে, তাই সে তাহাকে মেয়ে দিয়া চলিয়া গেল। এই মেয়েই পদ্মাবতী। পদ্মাবতীর সঙ্গে জয়দেবের ঠিক স্বামী ও স্ত্রীসম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয় না। কোন্ হিন্দুর ছেলে আপনাকে "পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী" বলিয়া পরিচয় দিতে পারে? তিনিও বোধ হয়, এক সময়ে খাঁটি সহজিয়া ছিলেন, কিন্তু পদ্মাবতীর পাল্লায় পড়িয়া অথবা অন্য কোন নিগূঢ় কারণে বৈষ্ণব সহজিয়া হইয়া গিয়াছিলেন।

এইবার চণ্ডীদাসের কথা। তাঁহার বাড়ীও বীরভূমে, কেন্দুলি হইতে বেশী দূরে নয়। তাঁহারও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে তাঁহার কথাটা জয়দেবের চেয়ে আরও একটু জটিল। কেন না, তিনি গোড়ায় ছিলেন বাশুলির সেবক, তাহার পর হইলেন রামী রজকিনীর চরণচারণচক্রবর্ত্তী, তাহার পর তাঁহার দেবতা হইলেন রাধা-কৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তি। জয়দেবের যদি দুই মূর্ত্তি হয়—খাঁটি এবং বৈষ্ণব সহজিয়া, তাহা হইলে চণ্ডীদাসের তিন মূর্ত্তি। এক মূর্ত্তি হইতে আর এক মূর্ত্তিতে কেমন করিয়া গেলেন, সেটাও একটি ভাবিবার কথা। বাশুলি তাঁহাকে রামী রজকিনীর সঙ্গে মিলাইয়া দিলেন, আবার তিনিই, কৃষ্ণের নির্ম্মাল্য একটি ফুল চণ্ডীদাস তাঁহাকে যখন অর্পণ করিলেন, তখন বলিলেন—ঐ ফুল আমার গুরুকে দেওয়া হইয়াছে, আমি আর কি করিয়া লইব? চণ্ডীদাস বলিয়া উঠিলেন—সে কি মা! তোমার

আবার গুরু! তিনি আবার কে? দেবী বলিলেন,—জান না? কৃষ্ণ আমার গুরু। তখন চণ্ডীদাস বলিলেন—তবে আমি কৃষ্ণকেই ভজিব। এ পর্য্যন্ত যত দূর লেখা-পড়া হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, চণ্ডীদাসের জীবনে তিন বার এই তিন রকম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। যখন তিনি বাশুলির সেবক, তখন তিনি খাঁটি বৌদ্ধ; যখন রামী রজকিনীর সেবক, তখন খাঁটি সহজিয়া; আবার রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির সেবা করিয়া তিনি বৈষ্ণব সহজিয়া হইয়া গেলেন। তাঁহার মধ্যে এইটুকুই বিচিত্র যে, তিনি যে ভাবেই থাকুন, যে রসেই মজুন, আগেকার দেবতাটিকে ভুলেন নাই। বাশুলিও তাঁহার সঙ্গের সাথী, রজকিনীও দেখা হওয়া অবধি তাঁহার সঙ্গের সাথী। বসন্তরঞ্জন বাবু ঠিক অনুমান করিয়াছেন যে, রামী রজকিনী বাশুলি দেবীর দেয়াসিনী ছিলেন, আর চণ্ডীদাস একজন বাশুলির ভক্ত। বাশুলি দেবী আর কেহ নহেন, আমরা ঘরে ঘরে যাঁহার পূজা করিয়া থাকি, তিনি সেই মঙ্গলচণ্ডী। আমরা "ধর্ম্মপূজাবিধি"তে বাশুলির যে ধ্যান ও আবাহন-মন্ত্র পাইয়াছি, তাহা নীচে তুলিয়া দিলাম,—

ওঁ আয়াতা স্বর্গলোকাদিহ ভুবনতলে কুণ্ডলে কর্ণপূরে
সিন্দুরাভাবসন্ধ্যা প্রবিকটদশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে।
ক্রীড়ার্থে হাস্যযুক্তা পদযুগকমলে নূপুরং বাদয়ন্তী
কৃত্বা হস্তে চ খড়্গং পিব পিব রুধিরং বাশুলী পাতু সা নঃ॥

ওঁ বাশুল্যৈ নমঃ।

ওঁ আবাহয়ামি তাং দেবীং শুভাং মঙ্গলচণ্ডিকাং।
সরিত্তীরে সমুৎপন্নাং সূর্য্যকোটিসমপ্রভাং॥
রক্তবস্ত্রপরীধানাং নানালঙ্কারভূষিতাং।
অক্ষতণ্ডুলদূর্ব্বাক্তাং অর্চ্চেন্মঙ্গলকারিণীং।
অসিদ্ধসাধিনীং দেবীং কালীং কিল্বিষনাশিনীং।
আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সন্নিধ্যমিহ কল্পয়॥

এই সকল দেবতা ঠিক হিন্দুর দেবতা নহেন, সুতরাং ইহাঁদের দেয়াসিনী থাকাই সম্ভব। বসন্তবাবুর অনুমান, সেই জন্য সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

এত ক্ষণ ত গৌরচন্দ্রিকা গেল। আসল কথা এই,—চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি নূতন খবর পাইয়াছি, তাহাও বসন্তবাবুর অনুগ্রহে। সেইগুলি পাইয়া চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে যাহা জানা আছে, তাহাতে সন্দেহ জন্মিয়াছে।

জানার মধ্যে প্রথমটি এই,—এক দিন আমি সাহিত্য-পরিষদের পুথিখানা দেখিতে গিয়াছি; দেখিলাম, বসন্তবাবু তন্ময় হইয়া কি পড়িতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ও কি? তিনি বলিলেন—চণ্ডীদাসের মৃত্যু। কতকগুলি বাজে পুথির পাতার মধ্য হইতে এইখানি বাহির হইয়াছে, ২০০।২৫০ বৎসর পূর্ব্বের হাতের লেখা। লেখাগুলি এই,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমো ॥

কাঁহা গেয়ো বন্ধু চণ্ডীদাস ।
চাতকি পিয়াসী গ(ঘ)ন   না পাইআ বরিসণ
নআনের নাগয়ে পিয়াস ॥
কি করিল রাজা গৌড়েস্বর ।
না জানিঞা প্রেম লেহ   ত্রেথাই ধরিস দেহ
বধ কৈলে প্রাণের দোসর ॥
কেনে বা সভাতে কৈলে গান ।
স্বর্গ মঞ্চ পাতালপুর   আবিঃর্ভূত পষু নর
মানিনীর না রহিল মান ॥
গান স্থনি পার্চ্ছার বেগম ।
অস্থির হইল মন   ধৈর্য্য নহে এক ক্ষণ
রাজারে কহে জানিঞা মরম ॥
রাণি মনঃকথা রাখিতে নারিল ।
চণ্ডিদাস সনে প্রিত   করিতে হইল চিত
তার প্রিতে আপন শুশাল্য ॥
রাজা কহে মন্ত্রিরে ডাকিয়া ।
স্বরাম্বিতে হস্থি আনি   পিষ্ঠে পেলি বান্ধ টানি
পিষ্ট খুদে বৈরী ছাড় গিয়া ॥
আমি অনাথিনী নারী   মাধবির ডালে ধরি
উর্চ্চস্বরে ডাকি প্রাণনাথ ।
হস্থি চলে অতি জোরে   ভালস্তে না দেখি তোরে
মাথাএ পড়িল বজ্রাঘাত ॥
রানি কহে ছাড়িয়া না জায় ।
কহিতে কহিতে প্রান   আর দেহ সমাধান
দুহুঁ প্রান একত্রে মীলায় ॥ ১ ॥

স্থন প্রিয় রজকিনি   আসকে হারালাও রাণী
এ বার তরাবে তুমি মোরে ।
বেগম সহিত লেহ   হা নাথ খুয়ালে দেহ
প্রাণে মাল্য এ রাজা গুর্ঁা[়ে]য় ॥

আসকে লম্ভিত প্রাণ তখনি করিলে গান
কেমনে জানিব হেন হবে।
বৈরি সত ডংসে গায় চেতন পাইএ তায়
তোমারে ডাকিএ আত্মা ভাবে ॥
এই করি আস মনে উর্দ্ধারিবে পতিত জনে
তবে সে চুল্লভ মানি প্রীত।
নতুবা ফুরাল্য দায় বৈরি চোটে প্রাণ যায়
কে য়ার করিবে মোরে হীত ॥
কান্ধি কহে চণ্ডীদাস দস দসার আস
পুর্ণ কর রজককুমারি ।
নহিলে একলা জাই সঙ্গে মোর কেহ নাই
কাছে আস্য তবে প্রানে মরি ॥ ২ ॥

স্থন বন্ধু চণ্ডীদাস চুখিনিরে সঙ্গে করি লেঃ ॥ ধ্রু ॥
চঞ্চল সভাব তোর চিত। সভাতে গাইলে গিত ॥
মনের মরম করি সার। অনুরাগে কি করিলে ফুৎকার ॥
পাতি হাট বসাত্যে না দিলে। আসক আনলে পড়াইলে ॥
বৈরি কাটে তোমার গায়। তুমি সে আনন্দ বাস তায় ॥
মোর অঙ্গ সব ক্ষেতি হৈল। রুধিরে বসন ভিজ্যা গেল ॥
পরসিতে এ জনার মন। কতেক কর্য্যাছ কদর্থন ॥
রামি কহে জদি সঙ্গে নিবে। তুরিতে পরান তেজ তবে ॥ ৩ ॥

স্থন প্রাণনাথ চণ্ডিদাস তার নির্ব্বন্ধন।
দৈবের কর্ম্ম ফাঁস না জায় খণ্ডন ॥
ছাড়ি পরিবার মোরে সঙ্গে কর
সভারে কহিলে সত্য।
বাসুলি বচন না কৈলে স্মঙরণ
তাহাতে মজাল্যে চিত্ত ॥
আমা মুখ চাএা গজপিষ্টে স্থএা
রয়্যাছ বন্ধন পাকে।
রাজা গৌড়ের স্বর চুষ্ট কলেবর
কেহো না বুঝাল্য তাকে ॥

নাথ আমি সে রজকবালা।
আমার বচন না সুনে রাজন
বুঝিল কৃষ্ণের লীলা॥
সুদ্ধ কলেবর হইল জর্জ্জর
দারুন সন্ধান ঘাতে।
এ দুখ দেখিয়া বিদরএ হিআ
অভাগিরে লেহ সাথে॥
কহেন রামিনি সুন গুনমনি
জানিলাঙ তোমার রিতি।
বাসুলি বচন করিলে লংঘন
সুনহ রসিকপতি॥ ৪॥

পার্চ্ছার বেগম কয়। সুন মহিনাথ মহাশয়॥
তুমি অবলা বচন রাথ। রসিকমণ্ডল দেথ॥
আমি সে অবলা নারি। তুমারে কহিএ বিনয় করি॥
জোড় করে কহি বানি। সুন নৃপচূড়ামণি॥
সুন রসের স্বরূপ সে। কেন বিনাস করহ তাহার দে
সে ষামান্য মানুস নহে। রতি স্থিতি তার দেহে॥
তাহার সুস্বর গানে। বিন্ধিল আমার প্রাণে॥
কেনে কৈলে এমন কাজ। ভুবনে রাখিলে লাজ॥
রাজা হে জবন জাতি। কি জানে রসের গতি॥
চণ্ডিদাসে করি ধ্যান। বেগম তেজল প্রান॥
সুনিঞা ধবিনি ধায়। পড়িল বেগম পায়॥ ৫॥

এই গানগুলি হইতে জানিতে পারা গেল যে, চণ্ডীদাস, রামী রজকিনীর সহিত কোন গৌড়েশ্বরের বাড়ীতে গান করিতে গিয়াছিলেন। গানে মুগ্ধ হইয়া রাণী চণ্ডীদাসকে কামনা করেন এবং তিনি সে কথা সাহসপূর্ব্বক রাজাকে বলেন। রাজা শুনিয়াই হুকুম দেন যে, চণ্ডীদাসকে হাতীর উপরে কাছি দিয়া কসিয়া বাঁধিয়া, হাতীকে চালাইয়া দেওয়া হউক। ইহাতেই চণ্ডীদাসের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁহার দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইবার পূর্ব্বেই রাণী প্রাণত্যাগ করেন—শুনিয়া রজকিনীও রাণীর পায়ে গিয়া পড়িল।

এই গৌড়েশ্বর কে? হিন্দু, না মুসলমান? গানে তাঁহাকে পাতসাহও বলিতেছে, রাঁজাও বলিতেছে; রাণীকে রাণীও বলিতেছে, বেগমও বলিতেছে। রাণী কিন্তু রাজাকে যবনই

বলিতেছেন এবং চণ্ডীদাসকে ছাড়িয়া দিবার জন্য নানারূপ অনুনয়-বিনয় করিতেছেন। সুতরাং এ গৌড়েশ্বর কে? রাজা গণেশ হইবেন কি? তিনি ত হিন্দু-মুসলমান সব সমভাবেই দেখিতেন। তাঁহারই বাড়ীতে কি চণ্ডীদাস গান করিতে গিয়াছিলেন? তাঁহাকে পাতসাহও বলা যায়, রাজাও বলা যায়; তাঁহার রাণীকে রাণীও বলা যায়, বেগমও বলা যায়। কিন্তু তিনি কি চণ্ডীদাসের মত একজন ধার্ম্মিক লোককে "চিত্রবধ" করিবার আদেশ দিবেন? বিশ্বাস ত হয় না। রাজা গণেশ কখনও মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, তিনি শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুই ছিলেন। সুতরাং এ গৌড়েশ্বর তিনি নহেন। তবে কি এ গৌড়েশ্বর গণেশের পুত্র যদু বা জালালুদ্দিন? ইনি ত মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং ইঁহাকে পাতসাহ এবং রাজা এবং ইঁহার রাণীকে রাণী ও বেগম, দুই বলা যাইতে পারে। তাহাতেও এক বিষম গোল উপস্থিত। কারণ, শ্রীমৎ আর, ডি, বন্দ্য মহাশয় "বৈজ্ঞানিক রীতিতে গবেষণা" করিয়া গণেশ ও যদুর যে কাল নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে তাঁহারই লিখিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির লিপিকাল মিলিতেছে না। তিনি লিখিয়াছেন,—"অতএব ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কৃষ্ণকীর্ত্তনের যে পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে, সম্ভবত খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল।" আমিও বলি "তথাস্তু"। যদিও আমার বিশ্বাস যে, তিনি যতগুলি প্রমাণ ও যুক্তি দিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই বৈজ্ঞানিক রীতিবিরুদ্ধ। 'শূদ্রপদ্ধতি'র লিপিকাল লেখা আছে,—"স° ১৪৪২ শাকে", উনি সেটিকে সংবৎ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন; এটি যে বিশেষ বৈজ্ঞানিক রীতিসিদ্ধ, তাহা বলিয়া ত মনে হয় না। আর তিন চারি জায়গায় এইরূপ সং—শক পাইয়াছি, সে সকল জায়গায় শকই ধরিয়া লইতে হইয়াছে, তাহাতে চারি দিক্ সামঞ্জস্যও হইয়াছে; কিন্তু সেটাও ঠিক বৈজ্ঞানিক রীতি নহে। ঠিক বৈজ্ঞানিক রীতিতে চলিলে উহার উপর নির্ভরই করিতে নাই। কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছেন। কারণ, তিনি সংবৎ ধরিয়া ১৪৪২—৫৭ করিয়া, ১৩৮৫ খৃঃঅঃ পাইয়াছেন এবং সেইটিই তাঁহার হিসাবের মূল ভিত্তি হইয়াছে। কারণ, তিনি বলিতেছেন,—"১৩৮৫ খৃঃ অঃ হইতে ১৪৯৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে লিখিত এই গ্রন্থত্রয়ে ব্যবহৃত অক্ষর অপেক্ষা কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীন অক্ষরসমূহ প্রাচীনতর।" এখন খৃঃ ১৩৮৫ই যে অসিদ্ধ হইয়া যায়। উহার মূল যে সং ১৪৪২, সে যদি শক হইয়া যায়, তাহা হইলে ১৪৪২+৭৮=১৫২০ খৃঃ অঃ হইয়া গেল।

আর ১৪৪২ যে সংবৎ নহে—শক, আর, ডি মহাশয় একটু প্রণিধান করিলেই সেটা দেখিতে পারিতেন। যেখানে ঐ অঙ্কটি আছে, তাহার পরপরই স্পষ্ট করিয়া বলা আছে, "শাকে যুগ্মসরোজসম্ভবমুখাম্ভোরাশিচন্দ্রান্বিতে।" এখানে শাকই আছে।

প্রমাণ ও যুক্তিতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত একমত হইতে না পারিলেও তাঁহার

সিদ্ধান্তে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। তিনি অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে কৃষ্ণকীর্ত্তনের অক্ষরগুলি পরীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু অঙ্কগুলি পরীক্ষা করেন নাই। সেগুলি পরীক্ষা করিলে তিনি জানিতে পারিতেন যে, '৩' এই সংখ্যাস্থানে 'ও' লেখা ১৩৬০ খৃঃ অব্দের পরে আর দেখা যায় নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিতে কিন্তু সকল জায়গাতেই '৩' এই সংখ্যার স্থানে 'ও' আছে; সুতরাং উহা খৃঃ ১৩৬০ বা তাহারও পূর্ব্বে লিখিত হইবে। শুদ্ধ যে "৩" স্থানে "ও" আছে, তাহা নহে। "৫" স্থানে " [illegible] " লেখাও খুব প্রাচীন।

যখন কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিখানি ১৩৬০ সালের পূর্ব্বে লেখা হইল, তাহা হইলে কি গ্রন্থকর্ত্তা চণ্ডীদাস যদুর সময়ে মরিতে পারেন? যদুর রাজত্বকাল খ্রীঃ ১৪১৪ হইতে খ্রীঃ ১৪৩১ পর্য্যন্ত। পুথি লেখার ৫৪ বৎসর পরে যদুর রাজত্বকাল আরম্ভ হইল, তাহা হইলে গ্রন্থ রচনার কত পরে? অতএব এ চণ্ডীদাস যদুর সময়ে হইতেই পারে না।

যদি বল, চণ্ডীদাসের এই মৃত্যু গণেশ ও যদুর অনেক পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল—গণেশের পূর্ব্বে ইলিয়স্ সাহিরা বাঙ্গালার রাজা ছিলেন। এই বংশে পাঁচ জন রাজার নাম পাওয়া যায়,—

১।	সামসুদ্দিন ইলিয়স সাহ—	১৩৪৫—১৩৫৮
২।	সেকেন্দর সাহ—	১৩৫৮—১৩৮৯
৩।	গিয়াসুদ্দিন আজম সাহ—	১৩৮৯—১৩৯৬
৪।	সহিবুদ্দিন হামজা সাহ—	১৩৯৬—১৪০৬
৫।	সামসুদ্দিন দ্বিতীয়—	১৪০৬—১৪০৯

ইঁহাদের কাহারও সময়ে চণ্ডীদাস যে কৃষ্ণকীর্ত্তন বা সহজিয়া গান গাইবার জন্য গৌড়ে যাইবেন, এমন ত বোধ হয় না। তবে সে-কালকার মুসলমান সুলতানেরা অনেক সময় হিন্দুদিগের উৎসবে যোগ দিতেন এবং হিন্দু কলাবতদের উৎসাহ দিতেন। সেই জন্য হয় ত গৌড়েশ্বরের বাড়ীতে গান করিতে গিয়া চণ্ডীদাস প্রাণ হারাইয়াছিলেন। অথবা বলিতে হয় যে, নূতন আবিষ্কৃত পদগুলি অনেক পরে কেহ রচনা করে, কি লিখিতে কি লিখিয়াছে।

আর এক উপায়ে এই সন্দেহ দূর করা যাইতে পারে—অর্থাৎ যদি আমরা একাধিক চণ্ডীদাস মানিয়া লই, তবে এই সমস্যার কতকটা মীমাংসা হইতে পারে। বসন্তবাবু বলেন, চণ্ডীদাসের পদাবলীর দুইটি গানের ভণিতায় "আদিচণ্ডীদাস" এই শব্দ আছে। শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলী, পং ৭৮৬ ও ৮১৫,—

আদি চণ্ডীদাস চারি সে বুঝান।
মূঢ় উঠাইল জানিল মান॥

পঞ্চরস অনুবাদ যে হয়।
আদি চণ্ডীদাস বিধেয় কয়॥

গান দুইটিই সন্ধ্যা ভাষায় লেখা, গুরুমুখী ভিন্ন অর্থগ্রহ হয় না। তবে কি একজন চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্ত্তনের গ্রন্থকর্তা, পদকর্তা আর এক চণ্ডীদাস? দুই জনেই বাশুলির ভক্ত। কৃষ্ণকীর্ত্তনে কিন্তু রামীর নামও নাই, নান্নুরের নামও নাই। বাশুলি যখন মঙ্গলচণ্ডী, তখন 'চণ্ডীদাস' শব্দেরও মানে বুঝা গেল। বাশুলি চণ্ডীর যাঁহারাই দাস, তাঁহারাই হইলেন চণ্ডীদাস। তাঁহারা সহজিয়া ছিলেন, অন্য সহজিয়াদের মত গান করিয়া বেড়াইতেন, সঙ্গে যোগিনীও থাকিত।

অন্ততঃ দুই জন চণ্ডীদাস স্বীকার করিলে, প্রথম চণ্ডীদাস জয়দেবের মত বৈষ্ণব হইয়া গিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন লিখিয়াছেন; আর একজন বৈষ্ণব হয়েন নাই; কখনও তিনি খাঁটি সহজিয়া গান গাহিতেন, কখনও বা রাধাকৃষ্ণকে লইয়া সহজিয়ার গান গাহিতেন। সম্ভবতঃ ইঁহারই মৃত্যু গৌড়েশ্বরের বাড়ীতে হইয়াছিল।

এ বিষয়ে একটু প্রমাণ আছে। একটি পদ কৃষ্ণকীর্ত্তনেও আছে, পদাবলীতেও আছে। কিন্তু পদাবলীর পদটি ভাষা সম্বন্ধে আধুনিক। যেন পুরান পদ দেখিয়া, আধুনিক ভাষায় কেহ ভাঙ্গিয়া লইয়াছে।

কৃষ্ণকীর্ত্তন—৩৩৪পৃঃ।	পদাবলী—১০১পৃঃ।
দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী	প্রথম প্রহর নিশি সুস্বপন দেখি বসি
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।	সব কথা কহিয়ে তোমারে।
বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে	বসিয়া কদম্বতলে সে কানু করেছে কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে॥ ইত্যাদি	চুম্ব দিয়া বদন উপরে॥ ইত্যাদি

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

চণ্ডীদাস

এতক্ষণ আমরা বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধেরা যে গান লিখিয়াছেন, সেই কথাই বলিতেছিলাম। এখন হিন্দুদিগের বাঙ্গালা গানের কথা বলিব। এই সকল গানের প্রধান কবি, 'কবি চণ্ডীদাস'। তিনি যেমনি প্রধান, তেমনি প্রাচীন। তাঁহার গানের কথা ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কথা আগে বুঝিতে হয়। তাই আমরা এখন বিষ্ণু ও বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব।

বিষ্ণু বেদের দেবতা। তিনি মধ্যাহ্নকালের সূর্য্য। তিনি তিন পা দিয়া জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। তাঁহার এক পা উদয়াচলে, এক পা অস্তাচলে, আর এক পা ঠিক মাথার উপরে। আমরা এখনও যে বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকি, তাঁহাকে সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়াই উপাসনা করিয়া থাকি। পুরাণ-কর্ত্তারা বিষ্ণুকে ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে স্থান দিয়াছেন। সে ত্রিমূর্ত্তি— ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ইঁহাদের মধ্যে বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, সুতরাং পৃথিবী পালনের জন্য তাঁহাকে অনেক বার অবতার হইতে হইয়াছে। যখনই যখনই প্রজা উৎপীড়িত হইয়াছে, তখনই তিনি অবতার হইয়াছেন। তাঁর অবতার অসংখ্য। তাহার মধ্যে দশটী প্রধান। এই দশের মধ্যেও আবার বরাহ, নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণ—ইঁহাদেরই অধিক উপাসনা হয়। কৃষ্ণের উপাসনা অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। কৃষ্ণ লইয়াই মহাভারত, কৃষ্ণ লইয়াই হরিবংশ; কৃষ্ণ লইয়াই ভাগবত। কিন্তু এ সকল গ্রন্থে রাধার কথা নাই। কতদিনে যে কৃষ্ণের সহিত রাধার মিলন হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। ইংরেজী প্রথম শতকে অন্ধ্র বংশে হালা বা শালিবাহন নামে একজন রাজা হন। তিনি মহারাষ্ট্রী ভাষায় সাতশত আদিরসের গান সংগ্রহ করেন, তাহার মধ্যে রাধা ও কৃষ্ণের নাম এক জায়গায় পাওয়া যায়। তাহার পর বহু দিন ধরিয়া রাধাকৃষ্ণের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং রাধাকৃষ্ণ প্রাচীন হইলেও, তাঁহাদের উপাসনা যে বেশী পরিমাণে প্রচলিত ছিল, বোধ হয় না।

কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ নামে একখানি আধুনিক পুরাণ আছে, এখানিতে শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদের কথা আছে। সুতরাং উহা শঙ্করাচার্য্যের পরের লেখা, অর্থাৎ ইংরেজী আটশত সালের পরের লেখা। এখানি আধুনিক বলিবার আর একটী কারণ আছে। আমাদের অষ্টাদশ মহাপুরাণ বেশ প্রাচীন, উহার মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ একখানি। নারদপুরাণে এই প্রাচীন অষ্টাদশ পুরাণের সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া আছে, সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেরও বিবরণ দেওয়া আছে। কিন্তু সে পুরাণের সঙ্গে এখন যেখানি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলিয়া চলিত আছে, তাহার সঙ্গে একেবারে মিল নাই। এখানি পাঁচটী খণ্ডে ভাগ করা। শেষটী শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড। উহাতে প্রথম হইতেই রাধার কথা। রাধা বৈকুণ্ঠেও বৈকুণ্ঠেশ্বরী। সেখান হইতে শ্রীদামের শাপে তাঁহাকে মানুষী হইয়া বৃন্দাবনে জন্মাইতে হয়। কৃষ্ণও তখন কংসাসুর বধের জন্য অবতার হইতেছিলেন। তাঁহাকেও যে কারণে বহুকাল বৃন্দাবনে বাস করিতে হইয়াছিল, তাহা সকলে

জানেন। এইখানে রাধাকৃষ্ণের মিলন হয়। সে মিলনও একরূপ অদ্ভুত। নন্দরাজা এক দিন কৃষ্ণকে কোলে করিয়া গরু বাছুর চরাইতে মাঠে গিয়াছিলেন, হঠাৎ দেবতারা সন্ধ্যার সময় ঝড় বৃষ্টি তুলিয়া দিলেন। নন্দ মহাফাঁফরে পড়িলেন। ছেলে লইয়া বাড়ী ছুটিয়া যাইবেন, সে যো নাই। সব গরু বাছুর মাঠে, এদিকে ছেলেও কাঁদিয়া উঠিল। এ সময়ে নন্দ দেখিলেন, রাধা সেখানে উপস্থিত। তিনি ছোট ছেলেটীকে রাধার কোলে দিয়া বলিলেন, তুমি একে বাড়ী পৌঁছিয়া দাও। রাধা কৃষ্ণকে কোলে করিয়া বাড়ী যাইতেছেন, পথে কৃষ্ণ নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। মনোহর যুবাপুরুষের মূর্ত্তি ধরিয়া রাধার কাছে প্রেমভিক্ষা করিলেন। ঠিক সেই সময় ব্রহ্মা আসিয়া দু'জনের বিবাহ দিয়া গেলেন। তাহার পর যা হইবার, তাহাই হইল।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের এই গল্পটী লইয়া মহাকবি জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দের মঙ্গলাচরণ লিখিয়াছেন,—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ॥

সুতরাং জয়দেব ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বেশ জানিতেন। কারণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণই রাধাকে প্রচার করিয়াছে এবং এ গল্পটী আর কোথাও পাওয়া যায় না।

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিখানি (অথবা যে বইখানি বসন্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বলিয়া ছাপাইয়াছেন) মোটামুটি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ছাঁচে ঢালা হইয়াছে। ইহারও পালাগুলির নাম "খণ্ড"। প্রথম পালাটীর নাম "জন্মখণ্ড"। এখানেও প্রথমেই আকাশে দেবসভা হইয়াছে। কংসের জন্য সৃষ্টি-নাশ হইতেছে, সৃষ্টি রক্ষা করিতে হইবে। ব্রহ্মার কথায় দেবতারা বিষ্ণুর কাছে গেলেন, বিষ্ণু তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া কংস বধ করিবেন, স্বীকার করিলেন এবং একগাছি কালো এবং একগাছি সাদা চুল দিয়া বলিয়া দিলেন,—বসুদেবের ঘরে দৈবকীর উদরে বলরাম ও কৃষ্ণের জন্ম হইবে, তাঁহারাই কংসকে নাশ করিবেন। নারদ আসিয়া কংসকে সে কথা বলিয়া দিয়া গেলেন। কংস প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাঁহার ভগিনী দৈবকীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই, তাহাকে মারিয়া ফেলিবেন। ছ'টী শিশু মারা যাওয়ার পর, সাদা চুল দৈবকীকে দেওয়া হইল। তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইলে, বলরাম বিমাতা রোহিণীর গর্ভে গিয়া রহিলেন, প্রকাশ করিয়া দিলেন, দৈবকীর গর্ভপাত হইয়াছে। অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়, কেমন করিয়া বসুদেব কৃষ্ণকে কোলে করিয়া লইয়া গিয়া যশোদার সদ্যোজাত মেয়েটীকে লইয়া দৈবকীর আঁতুড়ে রাখেন, সে কথা সকলেই জানেন। কংস যখন সেই মেয়েটীকে পাথরের উপর আছড়াইয়া মারিয়া ফেলে, তখন সে কন্যা আকাশে উঠিয়া কংসকে বলিয়া গেল,—

তোমারে মারিবে যে।
গোকুলে বাড়িছে সে॥

এই যে মহামায়ার কথা, ইহা কিন্তু কোন পুরাণে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় কেবল অতি প্রাচীন ভাস কবির 'বালচরিত্র' নামে নাটকে। চণ্ডীদাস এ কথা কোথায় পাইলেন, জানি না।

কৃষ্ণ যখন গোকুলে বাড়িতে লাগিলেন, তখন দেবতারা পরামর্শ করিয়া লক্ষ্মীকে বৃষভানুর কন্যা করিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইলেন এবং অভিমন্যু নামে একটা নপুংসকের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিলেন। এই অভিমন্যুই আয়ান ঘোষ বা আইহান। একে লক্ষ্মী আসিয়াছেন, তাহাতে নপুংসকের স্ত্রী হইয়াছেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতে তাঁহার ধর্ম্মমত আর কোন বাধা রহিল না। রাধার শাশুড়ী রাধার মায়ের কাছে গিয়া তাহার পিসীকে লইয়া আসিল। সেই রাধার অভিভাবক হইল, তাহার নাম বড়াই বুড়ী। সেই রাধার রক্ষণাবেক্ষণ করিত। বড়াইয়ের রূপ বর্ণনা,—

শেত চামর সম কেশে।
কপাল ভাঙ্গিল দুই পাশে॥
ভ্রূযুগ চুন রেখ যেহ্ন দেখি।
কোটর বাটুল দুই আখি॥
মাহা পুট নাশাদণ্ডহীনে।
উন্নত গণ্ড কপোল খীনে॥
বিকট দন্ত কপট বাণী।
ওঠ আধর উঠক জিণী॥
কাঠী সম বাহু যুগলে।
নাভি মূলে দুই কুচ লুলে॥
কুটিল গমন ঘন কাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

কাশ্মীরের কবি দামোদর ইংরেজী অষ্টম শতকে 'কুট্টিনীমত' নামে একখানি বই লিখিয়াছিলেন। তাহাতে কুট্টিনীর যে বর্ণনা আছে, এই বর্ণনা ঠিক সেইরূপ। মিথিলার কবি জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর বর্ণনরত্নাকরেও কুট্টিনীর ঠিক এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

রাধিকার বয়স এগার বৎসর হইলে, রাধিকার শাশুড়ী দই, দুধ, ঘি ও ঘোলেতে পসরা সাজাইয়া বড়াইয়ের সাথে রাধিকাকে মথুরার হাটে বিক্রয় করিতে পাঠান। একদিন বড়াই পথে যাইতে যাইতে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। রাধিকাকে দেখিতে না পাইয়া বুড়ী বড়ই ফাঁফরে পড়িল। সে বনের মধ্যে দেখিল, কাহারা গরু চরাইতেছে। বুড়ী রাখালকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার নাতিনী রাধাকে দেখিয়াছ? কৃষ্ণই গরু চরাইতেছিলেন, তিনি বড়াইয়ের কাছে রাধার পরিচয় লইলেন। তাহার রূপবর্ণনা শুনিলেন। তার পর বলিলেন, তুমি যদি রাধার সঙ্গে আমার ভাব করাইয়া দিতে পার, তবে তোমাকে আমি রাধার কাছে পৌছাইয়া দিতে পারি। কৃষ্ণ বড়াইয়ের হাতে পান সাজিয়া দিলেন এবং রাধিকার জন্য অনেক ফুল ও ফল ভেট পাঠাইলেন এবং দূর হইতে দেখাইয়া

দিলেন, ঐ বকুলতলাতে রাধা বসিয়া আছেন। বুড়ী সেখানে গিয়া খানিক কথাবার্ত্তার পর কৃষ্ণের কথা তাহাকে শুনাইয়া দিলেন এবং কৃষ্ণের ভেট তাহাকে দিলেন।

এ বোল সুণিআঁ নাগরী রাধা
হাণএ সকল গাএ।
যত নানা ফুল পান কর্পুর
সব পেলাইল পাএ॥
* * *
ঘরের সামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর
আছে সুলক্ষণ দেহা।
নান্দের নন্দন গরু রাখোআল
তা সমে কি মোর নেহা॥

বড়াই অনেক চেষ্টা করিল, কিছুতেই রাধাকে রাজী করিতে পারিল না, তখন কৃষ্ণ বড়াইয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, রাধাকে লইয়া বড়াই মথুরার হাটে দই দুধ বিক্রয় করিতে যাইবে এবং দান লইবার ছলে তিনি রাধিকার নিকট অনেক টাকা কড়ি চাহিবেন এবং না দিতে পারিলে একটু জোর জবরদস্তি করিবেন। ইহার নাম 'দানখণ্ড'। এ বইয়ের দানখণ্ড খুব লম্বা। এই দানখণ্ডেই কৃষ্ণ ও রাধার কথাবার্ত্তায় কবি বেশ বাহাদুরী করিয়াছেন। রাধিকা কৃষ্ণকে যথেষ্ট তিরস্কার করিতে লাগিলেন,—আমি তোর মামী, তোর গুরু লঘু জ্ঞান নাই। আমার বয়স অল্প, আমি তোর অত খোসামুদে কথা বুঝি না—আমার স্বামী আছে, শাশুড়ী আছে, শ্বশুর আছে; আমি বড় ঘরের মেয়ে, বড় ঘরের বউ, আমি ইচ্ছা করিলে কংস রাজাকে বলিয়া দিয়া তোকে খুব জব্দ করিতে পারি। কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই ছাড়িলেন না। তিনি তার দই দুধ সব ছড়াইয়া দিলেন এবং তার যত সখী ছিল, তাহাদের সকলের জন্য অনেক টাকা দান চাহিয়া বসিলেন। দান না দাও, আমি যা বলি, তাই কর। রাধিকা বড়াইয়ের কাছে নালিশ করিল। বড়াই কৃষ্ণের দিকে টানিয়াই কথা কহিল,—

সকল বএসে মোর এগার বরিষে।
বারহ বরিষের দান চাহ মোরে কিসে॥
এত্তেকেঁ বুঝিল তোর কাজের ভাষ।
লোক সুণিলে তোকে হৈব উপহাস॥ ১॥
পন্থ ছাড়ি দেহ কাহ্নাঞিঁ বিরোধ না কর।
তোর পুণেঁ্য জাওঁ বিকে মথুরা নগর॥ধ্রু॥
নাগর শেখর তোহ্মে নামে বনমালী।
তোর যোগ নহোঁ মোঞ আতিশয় বালী।

আধিক পীড়এ ষবেঁ ভুখিল ভষলে ।
তভোঁ নাহিঁ পাএ মধু কমল মুকুলে ॥২॥
বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার ঝী ।
মোর রূপ যৌবনে তোহ্মাতে কী ॥
দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে ।
আরতিল কাক তাক ভখিতেঁ না পারে ॥৩॥
রতি কথা সখি মুখে না শুনীলোঁ কানে ।
বারেক রাখহ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার সমানে ॥
চরণে ধরোঁ। তোর দেব নারায়ণ ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥৪॥

কৃষ্ণ কোন কথার উত্তর না দিয়া কেবল রাধিকার রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন ও তাঁহার প্রণয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কখনও কখনও পুরাণ হইতে পরস্ত্রীগমনের কথা বলিতে লাগিলেন এবং কখনও কখনও 'আমি যে ত্রিদশের নাথ, আমি কত বড় বড় কর্ম্ম করিয়াছি ; আমি তোমার কংস রাজাকে ভয় করি না'—ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন।

একবার রাধা বলিলেন,—

সুণহ (মোর বচন) নটক টেণ্ডন কাহ্ন
কেহ্নে কর অপমানকে বাটে ।
তোর কি বাড়িতে আছোঁ তোর কিবা ভাত খাওঁ
ন মানসি কংস রাঅ পাটে ॥

কৃষ্ণ জবাব দিতেছেন,—

হইএ আহ্মে দামোদর মারিলোঁ অসুর বল
কত দাপ দেখাসসি মোরে ।
মারিবোঁ কংস অসুর তোর দাপ করোঁ চুর
দেখোঁ কে বা পরিষাএ তোরে ॥

রাধার জবাব,—

হঅ গরু রাখোআল বোল আকাশ পাতাল
তা সুণি কে বা পাতিআএ ।
তোহ্মে বাটে মাহাদাণী মোহোঁ আইহন রাণী
বল কৈলে জণায়িবোঁ রাজাএ ॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন,—

রাধা হে তোর বলে ভাণ্ড ভাঁগিআঁ
সকল দধি খাইবোঁ আপণ ইছাএ ।

দানখণ্ডে জোর জবরদস্তি করিয়া কৃষ্ণ আপনার অভিলাষ পূরণ করিলেন। আর এক দিন রাধিকাকে নৌকায় চড়াইয়া নদীর মাঝখানে তাহার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিলেন। রাধিকা যখন বুঝিলেন, কৃষ্ণের দশা এইরূপ, তখন তিনি এক দিন রাস্তায় বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, আমি আর এ পসরা বহিতে পারি না, বড়াই আমার জন্য একটা মজুর আনিয়া দে। বড়াই কৃষ্ণকে আনিয়া দিল। আবার কৃষ্ণ ও রাধিকার কিছু গালাগালি হইল, কিন্তু রাধিকা কৃষ্ণকে দিয়া ভার বহাইয়া লইলেন। আর এক দিন রাধিকা ভয়ানক রৌদ্রে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া গাছতলায় বসিয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ কি করেন, তাঁহার মাথায় ছাতা ধরিয়া তাঁহাকে বাড়ীর কাছে পৌছিয়া দিলেন। পুস্তকের যে খণ্ডে এই সকল ব্যাপার আছে, তাহার নাম 'ভারখণ্ড' ও 'ছত্রখণ্ড'। তাহার পর 'বৃন্দাবনখণ্ড'।

এ বার রাধা বড়াইয়ের সহিত পরামর্শ করিতেছেন, কেমন করিয়া কৃষ্ণের কাছে যাওয়া যায়। বড়াই বলিল, মথুরাতে পসরা লইয়া চল। শাশুড়ী অমনি আর যাইতে দিবে না; তুমি এক কাজ কর, আমার সখীদের শাশুড়ীদের কাছে যাও। আমার শাশুড়ীর বিরুদ্ধে তাহাদিগকে ক্ষেপাইয়া দাও; বল, আইহনের মা রাধাকে মথুরায় যাইতে দেয় না, তাই কোন গোয়ালিনীর মথুরায় যাওয়া হয় না। তারা বড়লোক, সব করিতে পারে; দই দুধ না বেচিলে তোমাদের সংসার কিসে চলিবে?—এই কথা শুনিয়া সব বুড়ী গোয়ালিনী রাগিয়া রাধার শাশুড়ীর কাছে বলিল,—

তোহ্মে এবেঁ গোআলত ভৈলা বড় জাতী।
আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ এক মতী॥
আপণ আপণ বহু হাটক পাঠায়িব।
তোহ্মার ঘরত অন্ন পাণি না খাইব॥
এ বোল সুণিআঁ। ডরে আইহনের মাএ।
প্রণাম করিআঁ বুইল তা সভ্ভার পাএ॥
কালি হৈতেঁ যাইবে রাধা মথুরা নগর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর॥

পরদিন সকাল বেলা সব সখীরা একত্র হইয়া বিচিত্র সাজগোজ করিয়া—

দধি দুধ ঘৃত ঘোল সাজিআঁ পসারা।
রাধা সঙ্গে চলি জাই হাট মথুরা॥

* * * *

ডাক দিআঁ আনায়িল বড়ায়ি করি সঙ্গে।
তখনে হাসিআঁ বুয়িল সভ্ভাক বড়ায়ি।
এবেঁসি নাতিনী সব মণেঁ সুখ পাই॥
নানা ফুল ফুটিলছে মাঝ বৃন্দাবনে।
তাক পিন্ধি মথুরাক করিউ গমনে॥

রাস্তায় যাইতে যাইতে বড়াই বলিতে লাগিল, কানাই এখন বড় ভাল ছেলে হইয়াছে। সে আর বাটদান, হাটদান, ঘাটদান কিছুই চাহে না। কেবল লোকের উপকার করে। যে সব লোক হাটে যায়, তাহাদের ফুল ফল দিয়া সন্তুষ্ট করে এবং সঙ্গে করিয়া যমুনার ধারে পৌঁছিয়া দেয়। অতএব তোমরা তাহাকে আর ভয় করিও না। সে এখন বড় ভাল লোক হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া সব গোয়ালিনীর ইচ্ছা হইল, বৃন্দাবনের ফুল ফল কিছু ভোগ করে—

বৃন্দাবনের ফুলে সন্ধার হইল আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥

সময়টা বসন্তকাল। মলয় পবন বহিতেছে, কিন্তু বৃন্দাবনে সব ঋতুই বিরাজ করিতেছেন, সকল ঋতুর ফুলই সেখানে আছে। সম্বৎসরের যত ফল ফুল—সবই বৃন্দাবনে পাওয়া যায়। গোয়ালিনীরা সেই ফুলের লোভে সব বৃন্দাবনের দিকে চলিয়া গেল। কৃষ্ণ রাধাকে দেখিয়াই বলিলেন,—

শপথ করিআঁ রাধা বোলোঁ এ বচনে।
তোহ্মার আন্তরে কৈলোঁ এ বৃন্দাবনে॥
এক ঠাঁয়ি থুয়িআঁ রাধা মাথার পসার।
ফুল পত্র ফল খাআ ত্রিভুবনে সার॥

রাধা বলিলেন,—আমি ত আসিয়াছি, আমার সঙ্গে অনেক সখী আসিয়াছে। তুমি ইহাদিগকে সন্তুষ্ট কর। ইহারা যেন আমার নিন্দা করিতে না পারে।

সামী সাসু দুইহো খরতর।
আর খল সকল নগর॥
সব তোর মোর দোষ চাহে।
তেঁসি মোর মন থীর নহে॥
তোর মনে হেন পড়িহাসে।
ফুল ফলের দিআঁ আশে।
সখিগণ নেহ চারি পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

কৃষ্ণ বলিলেন, তুমি ঠিক বলিয়াছ; আমার মনের কথা টানিয়া বলিয়াছ।

ষোল সহস্র তোর সখিগণ॥
সন্ধার তোষিব আহ্মে মন॥
করিআঁ বিবিধ তনু আহ্মে দেবরাজে।
বিলসিবোঁ গোপী সমাজে॥

এই বলিয়া কৃষ্ণ সকল সখীদের কাছে বলিলেন,—এই তোমাদের অভয় দিলাম, তোমরা যত পার ফুল ছেঁড়, ফল খাও। যখন দেখিলেন, ফুল উঁচায় রহিয়াছে, একজন পাড়িবার চেষ্টা করিতেছে—পারিতেছে না, তখন তিনি তাহাকে কোলে লইয়া উঁচু করিয়া ধরিলেন, সে আপন হাতে ফুল

পাড়িয়া ভারী খুসী হইল। গোপীরা যে যেখানে বেড়াইতেছে, কৃষ্ণ তাহাদের কাছে গিয়া তাহাদের সহিত নানা রসরঙ্গ করিতে লাগিলেন।

খণেক গুণিল কাহ্নে।
ষোল সহস্র গোপী তোষিবোঁ কেমনে॥
আনেক হয়িআঁ তখনে।
বিলসিল গোপীগণে।
যাহারে রমএ সেসি দেখে কাহ্নে॥

ইহারই নাম রাস। চণ্ডীদাস রাস শব্দটী ব্যবহার করেন নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ সে শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন এবং জাঁকালো রাসমণ্ডপ করিয়া সেখানে কৃষ্ণকে কেলি করাইয়াছেন। কৃষ্ণ কায়ব্যূহ রচনা করিয়া গোপীগণের সহিত কেলি করিলেন।

কিন্তু কৃষ্ণ হঠাৎ দেখিলেন, রাধিকা নিকটে নাই। তখন তিনি সব দেহ সংহার করিয়া আবার এক কানাই হইয়া গোপীগণকে ছাড়িয়া রাধিকার কাছে গেলেন। রাধিকা গোপীগণের প্রতি স্নেহ দেখিয়া মান করিয়া বসিয়াছেন। কৃষ্ণ যাইবামাত্র তিনি বলিলেন,—

ভাল উপদেশ দিলোঁ মো তোরে
আপণার মতিমোষে।
এখণে তাহার ফল ভুঞ্জোঁ মোএঁ
আপণে আপণ দোষে॥

* * *

যে পর পুরুষ সমে নেহ করে
তার হএ হেন গতী।
দৈব দোষে কাহ্ন তোহ্মাত ভজিলোঁ
বঞ্চিলোঁ আপণ পতী॥
যেহেন বাহির তেহেন ভিতর
সরূপেঁ জাণিলোঁ তোরে।

* * *

শপথ করিআঁ বুইলোঁ মো তোরে
না জায়িবোঁ তোহোর পাশে।
তোহ্মার চরিত্র দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ
কে নাহিঁ উপহাসে॥

এ কথা শুনিয়া কৃষ্ণের বড় ভয় হইল। তিনি রাধিকার মান ভঞ্জনের জন্য বলিতে লাগিলেন,—

যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ
দশন রুচি তোহ্মারে।
হরে দুরুবার ভয় আন্ধকার
সুন্দরি রাধা আহ্মারে॥
তোহ্মার বদন সংপুন চান্দ
আধর আমিঅাঁ লোভে।
পরতেখ তোর নয়ন চকোর
যুগল নিশ্চল শোভে॥
মদন বাণে দগধ ভৈলোঁ
তোর অকারণ মাণে।
বদন কমল মধুপান দিআঁ
রাখহ মোর পরাণে॥
যবেঁ সতোঁ কোপ কয়িলে
তবেঁ মোরে হান নয়ন বাণে।
দৃঢ় ভুজযুগেঁ বন্ধন করিআঁ
অধর দংশ দশনে॥
তোহ্মে সে মোহোর রতন ভূষণ
তোহ্মে সে মোহোর জীবনে।

এহা বুঝি রাধা মোরে দয়া কর
বুলি তেঁ আতি যতনেঁ॥
তোহ্মার নয়ন মলিন নলিন
আধরে কোকনদ রূপে।
মদন বাণে কৃষ্ণক রঞ্জিলেঁ
হএ তোর আনুরূপে॥
এ তোর কুচ শোভে মণি (মাল)
জঘনে নাদ করউ রসনে।
বোল হৃদয়ত করোঁ মো তোহোর
থল কমল চরণে॥
মদন গরল খণ্ডন রাধা
মাথার মণ্ডন মোরে।
চরণ পল্লব আরোপ রাধা
মোর মাথার উপরে॥
পালাউ আহ্মার মদন বিকার
সত্বরেঁ করহ আদেশে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড় চণ্ডীদাসে॥

কৃষ্ণ পায়ে ধরিলেন, কিন্তু তাহাতেও রাধার মান ভাঙ্গিল না। তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন, তোমার সখীরা আমার বৃন্দাবনের সব গাছ ভাঙ্গিয়াছে, ডালপালা ভাঙ্গিয়াছে; আমি তোমার কাছ হইতে ইহার দাম তুলিয়া লইব।

রাধা বলিলেন,—বাঃ, তুমি খোসামদ করিয়া আমাকে এখানে আনিলে, সখীদের বন দেখাইলে; তাহাদের অভয় দিলে—এখন তুমি আমার কাছে দাম চাও? এ তোমার বড় কুচরিত!

কৃষ্ণ বলিলেন,—আমি তোমায় আনি নাই। তুমি রাজপথে মথুরায় যাইতেছিলে, অন্তব্যস্ত হইয়া আমার বৃন্দাবনে কেন আসিলে? আর আমার এই ক্ষতি করিলে? আমি অনেক যত্নে বৃন্দাবন তৈরী করিয়াছি, সব নষ্ট করিয়া দিলে! এইরূপ কচাল করিতে করিতে অনেকক্ষণে রাধার মান ভাঙ্গিয়া গেল, রাধাকৃষ্ণের আবার মিলন হইল। দুইজনে নানারূপ কেলি করিতে লাগিলেন।

ইহার পর কালিয়দমনখণ্ড। এ খণ্ডে রাধার কথা নাই। তাহার পর, যমুনাখণ্ডে জলকেলি, তার পর হারখণ্ড, কৃষ্ণ রাধিকার হার ছিঁড়িয়া দিয়াছিলেন, রাধিকা যশোদার কাছে গিয়া নালিশ করিলেন। তাহার পর বাণখণ্ড। মায়ের কাছে নালিশ করায় কৃষ্ণের রাগ হইয়াছে, তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, রাধাকে পায়ে ধরাইব, তবে ছাড়িব; শেষে হইলও তাই। তাহার পর বংশীখণ্ড। কৃষ্ণের বাঁশী রাধা চুরি করিলেন এবং অনেকক্ষণ 'চুরি করি নাই' বলিলেন, তার পর বাঁশী দিয়া

তাঁহার সহিত ভাব করিলেন। তার পর, রাধার বিরহ। কৃষ্ণ এখন বেশ যুৎ পাইয়াছেন, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর রাধাকে চাই না। রাধিকার বড় অনুতাপ হইল, তিনি বলিলেন,—

শিশুকালে আহ্মে মতি ভোলে।
বড়ায়ি না লয়িলোঁ কাহ্নের তাম্বুলে।
এবেঁ আহ্মার মন মজিল বাল গোপালে ॥
তোহ্মে যাত্রা কর শুভক্ষণে।
বড়ায়ি ঝাঁট চল কাহ্নাঞিঁর থানে ॥
বিনয় বচনে তোষিআঁ কাহ্নাঞিঁ আন মোর থানে ॥
দূতী বোল গিআঁ কাহ্নের থানে।
বারেক দয়া করি মোরে দেউ দরশনে ॥

দূতী বলিলেন,—

গরবেঁ না তুষিলোঁ হরী।
পাছু না গুণিলী আছিদরী ॥
বড় রোষ তার মনে জাগে।
এহা শুণী না মারে মোকে বড় ভাগে ॥

বড়াইর অনুরোধে অনেক কষ্টে কৃষ্ণ একবার দেখা করিতে রাজী হইলেন। তিনি রাধাকে আসিতে বলিলেন। রাধা আসিলে দুই জনে কেলি করিলেন। তার পর, কৃষ্ণের উরুর উপর মাথা রাখিয়া রাধা ঘুমাইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ এই সুযোগে রাধার মাথাটী নামাইয়া রাখিয়া সরিয়া পড়িলেন। ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া রাধা দেখিলেন, কৃষ্ণ নাই। তিনি বিলাপ করিতে লাগিলেন; বার বার বড়াইকে পাঠাইতে লাগিলেন, কিন্তু কৃষ্ণের আর উদ্দেশ পাওয়া গেল না। বড়ু চণ্ডী-দাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন শেষ হইয়া গেল।

এই বইখানি যদিও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ছাঁচে ঢালা, কিন্তু কৃষ্ণের জীবনসম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তের সঙ্গে ইহার অনেক তফাৎ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে রাধা বৈকুণ্ঠেই ছিলেন, বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীদামের শাপে তিনি পৃথিবীতে আসেন। কৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হইলে, ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাদের বিবাহ দিলেন আয়ান ঘোষের নাম ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে নাই, পুরাণকারেরা এই সকল কথা লিখিয়া কৃষ্ণরাধার প্রেমটা দম্পতী-প্রেমরূপেই দেখাইয়া গিয়াছেন। সর্ব্ব অংশেই বামনাইটা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

বড়ু চণ্ডীদাসের বইয়েও সব দিক্ রক্ষা করিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে বামনাই করিয়া নয়। নারায়ণ যেমন দুইগাছি চুল দিয়া বলিলেন, আমি যখন কৃষ্ণ ও বলরামরূপে অবতার হইব, অমনি দেবতারা সাধ্যসাধনা করিয়া লক্ষ্মীকেও পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিলেন, সেই লক্ষ্মীই রাধা। কবি তাঁহাকে আইহনের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। আইহন নপুংসক। সুতরাং—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।

পতি ক্লীব, সুতরাং রাধা অনায়াসেই অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারেন। কবি তাঁহাকে কৃষ্ণের হাতে অর্পণ করিয়া ধর্ম্মটা কোনরূপে বজায় রাখিলেন।

রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলন পুরাণের মতে নন্দ রাজা করাইয়া দেন। কিন্তু বড়ু বড়াইয়ের হাতে পান ও ফুলের ডালি দিয়া কৃষ্ণই যে মিলনের জন্য ব্যাকুল, তাহা দেখাইয়াছেন। রাধিকা প্রথম সে পানডালা ফেলিয়া দিলেন, বড়াইকে এক চড়ও মারিলেন। কিন্তু বড়াই তাঁর মায়ের পিসী, সুতরাং বড়াইকে তাড়াইতে পারিলেন না। ক্রমে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

পুরাণের মতে কৃষ্ণরাধিকা দেবতা। তাঁহাদের সব কার্য্যই শাস্ত্রসঙ্গত ও দেবতাদের মতই জাঁকালো। বড়ু চণ্ডীদাসের মতে একজন গোয়াল, আর একজন গোয়ালিনী। গোয়ালিনী মথুরার হাটে দই দুধ বিক্রয় করিতে যায়, আর কৃষ্ণ তাহা কাড়িয়া খান আর রাধিকার উপর নানারূপ অবৈধ উৎপীড়ন করেন। দু'জনেরই কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী, মতিগতি গোয়ালাদেরই মত। তাঁহারা যে ঝগড়া করেন, সেও গোয়ালাদের মত।

পুরাণের রাস খুব জাঁকালো। কিন্তু রাসের আগেই বস্ত্রহরণ। বড়ু চণ্ডীদাসে রাসের পর কালিয়দমন, যমুনাখণ্ড বা জলকেলী ও বস্ত্রহরণ। পুরাণের রাস এইরূপে আরম্ভ হয়,—গোপীরা সকলে মিলিয়া কৃষ্ণকে পতি পাইবার আশায় পার্ব্বতীর পূজা করে। পার্ব্বতী বর দেন, তিন মাস পরে মধুমাসে শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা ও গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা করিবেন। কৃষ্ণ এই তিন মাস ধরিয়া রাসমণ্ডপ খুব করিয়া সাজাইলেন। গোপীরা কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, নিঃশঙ্ক ও কামমোহিত হইয়া রাসমঞ্চে গমন করিল। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে সন্তুষ্ট করিয়া, রাধিকাকে সঙ্গে লইয়া রাসমঞ্চ ত্যাগ করিলেন এবং ভারতবর্ষের সমস্ত দেশ রাধিকাকে লইয়া ভ্রমণ করিলেন ও সেখানে বিহার করিলেন। সকলের শেষে মলয়পর্ব্বতের উপরে গিয়া রাধাকে নানারূপ আধ্যাত্মিক উপদেশ দিতে লাগিলেন।

বড়ু চণ্ডীদাসের রাস—রাসই নয়। তিনি রাস শব্দই ব্যবহার করেন নাই। সেটা একটা গয়লা-গয়লানীর ব্যাপার। তাহা পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি। পুরাণে রাসের মধ্যে মান নাই, কিন্তু চণ্ডীদাসে মান কিছু চড়া। রাধিকা নিজেই বলিলেন, আমার শাশুড়ী দুরন্ত; আমার স্বামী দুরন্ত; তোমার আমার কুৎসা পাইলে লোকে আর কিছু চায় না। সুতরাং তুমি আমার সখীদের আগে ঠাণ্ডা কর, সন্তুষ্ট কর; তাহাদের অভিলাষ পূরণ কর। কৃষ্ণ যখন তাহা করিলেন, তখন রাধিকা ভাবিলেন, ভালরে ভাল, আমি স্বামী ছাড়িয়া কৃষ্ণের কাছে আসিলাম, আর তাহার এই ব্যবহার। সে আমার সাম্‌নে আর পাঁচ জনকে লইয়া কেলি করিতে লাগিল। যাক্, আমি কৃষ্ণকে চাই না। কৃষ্ণ অনেক স্তব স্তুতি করিলেন, পায় ধরিলেন; তাহাতে হইল না। কিন্তু যখন বলিলেন, তোর সখীরা বৃন্দাবন ভাঙ্গিয়াছে, তোকে দাম দিতে হইবে, নহিলে তোকে বাঁধিয়া রাখিব, তখন রাধিকা ঝগড়ায় হারিয়া কৃষ্ণের কথায় রাজী হইলেন।

জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" আরম্ভ হইয়াছে বসন্তবর্ণন লইয়া। তাহার পর গোপীদের সহিত রাস। তাহা দেখিয়া রাধিকার মান। উভয় পক্ষে দূতী পাঠান। কৃষ্ণ রাধিকাকে ডাকিয়া

পাঠাইলেন। রাধিকা অত্যন্ত দুর্ব্বল, আসিতে পারিলেন না। কৃষ্ণই আসিলেন এবং তাঁহার স্তব স্তুতি করিয়া পায় ধরিয়া, তাঁহার মান ভঞ্জন করিলেন।

জয়দেবের যতগুলি গীত আছে, এই পায়েধরার গীতটীই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী,—

অত্রান্তরে মসৃণরোষবশামসীম-
নিঃশ্বাসনিঃসহমুখীং সুমুখীমুপেত্য।
সব্রীড়মীক্ষিতসখীবদনাং প্রদোষে
সানন্দগদ্গদপদং হরিরিত্যুবাচ॥

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরং।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা
রোচয়তি লোচনচকোরং॥
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং
দেহি মুখকমলমধুপানং॥
সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খরনয়নশরঘাতং।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখজাতং॥
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং।

ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নং॥
নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং
ধারয়তি কোকনদরূপং।
কুসুমশরবাণভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপং॥
স্ফুরতু কুচকুম্ভয়োরুপরি মণিমঞ্জরী
রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশং।
রসতু রসনাপি তব ঘনজঘনমণ্ডলে
ঘোষয়তু মন্মথনিদেশং॥
স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং
জনিতরতিরঙ্গপরভাগং।
ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ং
সরসলসদলক্তকরাগং॥
স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো
হরতু তদুপাহিতবিকারং॥

ইহার পর সখীরা আসিয়া রাধিকার মান ভঞ্জন করিয়া দিল ও তাঁহাদের মিলন হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জয়দেব ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের কথা জানিতেন। তাঁহার মঙ্গলাচরণ শ্লোকের ভাব তিনি ঐ পুরাণ হইতেই লইয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে মান নাই। মানভঞ্জনও নাই। জয়দেব এ মানভঞ্জনের কথা পাইলেন কোথায়? বলিবে তাঁহার নিজের রচনা। কিন্তু নিজের রচনা হইলেও ইহার মূল ত কোথাও আছে। বোধ হয়, বড়ু চণ্ডীদাসের বৃন্দাবনখণ্ডই তাহার মূল। বড়ু চণ্ডীদাসের বইখানি কৃষ্ণের ইতিহাস। তাঁহার জন্ম হইতে রাধিকার বিরহ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে; বাকী কতদূর ছিল, জানি না। কিন্তু জয়দেবের গীতগোবিন্দে রাস, মান ও মানভঞ্জন, বড়ু চণ্ডীদাসের বৃন্দাবনখণ্ড মাত্র। দুইএরই আরম্ভ বসন্ত-বর্ণন লইয়া। তাহা হইলে কি মনে হয় না যে, জয়দেব এই মানের কথা বড়ু চণ্ডীদাসের বই হইতে লইয়াছেন? তিনি উচ্চ অঙ্গের কবি, সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত; বড়ু একজন ভাষা-কবি। বলিতে গেলে একরকম মেঠো কবি। জয়দেব লক্ষ্মণ সেনের পঞ্চরত্নের এক রত্ন। তিনি রাজকবি। বড়ু চণ্ডীদাস সাধারণ

লোকের জন্য পাঁচালী ও গীত লিখিয়াছেন। জয়দেব চণ্ডীদাসের গোয়াল-গোয়ালীদের যে সমস্ত ব্যাপার আছে, সব নিঃশঙ্কে ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি একজন বড় কবি, পরের জিনিস ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া অলঙ্কারশাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কেমন করিয়া কাব্য লিখিতে হয়, ঠিক জানেন। তাই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও বড়ু চণ্ডীদাস, এই দুইজনকে ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া গীতগোবিন্দ লিখিয়াছেন। জয়দেবের "বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী" এই গানটীর সহিত বৃন্দাবনখণ্ডের "যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ দশনরুচি তোহ্মারে" এই গানটী মন দিয়া তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, চণ্ডীদাসের গানটী জয়দেব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কেন না, জয়দেবের অমন অলোকসামান্য গানের পর চণ্ডীদাস ওরূপ গান লিখিতে কখনই সাহস করিবেন না। জয়দেব আরও অনেক জায়গায় চণ্ডীদাসের গানের পাপ্‌ড়িগুলি লইয়া অলৌকিক সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। সে সৃষ্টির পর ওরূপ পাপ্‌ড়িগুলি কোন কবিই সাহস করিয়া লিখিতে পারেন না।

বসন্ত বাবু বড়ু চণ্ডীদাসের পুথি ছাপাইয়াছেন এবং ছাপাইবার জন্য বেশ খাটিয়াছেন। নিজের মত কোন জায়গায় জাহির করিবার চেষ্টা করেন নাই; অন্ততঃ তাহা লইয়া বাড়াবাঁড়ি কিছু করেন নাই। বড়ু চণ্ডীদাসের পুথিখানির হাতের লেখা ১৩০০ হইতে ১৪০০ ইংরেজী সনেরই এবিষয়ে দুই মত নাই। রাখাল বাবুও স্বীকার করিয়াছেন, ১৪ শতকের লেখা; আরও সকলে স্বীকার করিয়াছেন। ১৪ শতকের শেষার্দ্ধে বাঙ্গালায় কতকটা শান্তি থাকিলেও ১২০০ হইতে ১৩৫০ পর্য্যন্ত এখানে কিছুমাত্র শান্তি ছিল না। আমরা এ পর্য্যন্ত এই ১৫০ বছরের হাতে লেখা সংস্কৃতই হউক বা বাঙ্গালাই হউক, কোন পুথিই আজও পাই নাই। এই ঘোর অরাজকের সময় যে বড়ু চণ্ডীদাস বসিয়া এত বড় একখানা বই লিখিবেন, এ কথা আমি ত বিশ্বাস করিতে পারি না। তাই আমার মনে হয়, বইখানা হিন্দু আমলের রচনা। বোধ হয়, লক্ষ্মণ সেনের সময়ই এই বইখানি রচিত হইয়াছিল। সে সময়ে বৈষ্ণবধর্ম্ম লইয়া বাঙ্গালায় একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। তাই শৈব বল্লাল সেনের ছেলে লক্ষ্মণ সেন বৈষ্ণব হইয়া গেলেন এবং বৈষ্ণব কবি জয়দেবকেঁ খুব আদর করিলেন। কাশ্মীর দেশের একখানি জয়দেবের পুঁথিতে লেখা আছে—লক্ষ্মণ সেনই জয়দেবকে 'কবিরাজ' এই আখ্যা দিয়াছিলেন। জয়দেব যখন গীতগোবিন্দ লেখেন, তখন তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণবের বই সকল পড়িতে এবং আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল—সে পুথি বাঙ্গালাতে হউক বা সংস্কৃতেই হউক। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, তিনি কতক লইয়াছেন ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতে, আর কতক লইয়াছেন, বড়ু চণ্ডীদাসের পুস্তক হইতে। বলিবে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে যে সব কথা নাই, বড়ু চণ্ডীদাস সে সব কথা পাইলেন কোথায়? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, সে কালে বাঙ্গালা দেশে কৃষ্ণরাধা সম্বন্ধে নানারূপ কথা প্রচলিত ছিল। চণ্ডীদাস সেগুলি সব লইয়াছেন। কারণ, তাঁহার শ্রোতা সাধারণ বাঙ্গালী। সংস্কৃতে বিশেষ বিজ্ঞ নহেন। পুরাণ বামনাইএর দিক্ হইতে তার অনেক ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন, জয়দেবও সংস্কৃতকবির দিক্ হইতে তাহার অনেক ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু সেগুলি পূর্ণমাত্রায় আছে—বড়ু চণ্ডীদাসের পুথিতে।

এ দেশের লোকের সংস্কার যে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের পূর্ব্বে রাধার নাম কোথাও পাওয়া যায় না। সে সংস্কারটী ভুল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হালা সপ্তশতীতে রাধার নাম আছে এবং সেখানে কৃষ্ণের নামও আছে। উহার ৮৯ শ্লোকে আছে ;—

"মুহমারুএণ তং কহ্ন গোরঅং রাহিআএ অবণেন্তো।
এতাণঁ বল্লবীণং অণ্ণাণঁ বি গোরঅং হরসি॥"—গাথাসপ্তশতী ১।৮৯

ইহার সংস্কৃত ব্যাখ্যা।— মুখমারুতেন ত্বং কৃষ্ণ গোরজং (-চক্ষুরাগঃ) রাধিকায়া অপনয়ন্। এতাসাং বল্লবীনামন্যাসামপি গৌরবং হরসি। সৌভাগ্যগর্ব্বখণ্ডনাৎ।

রাধার চক্ষে গরুর পায়ের ধূলা লাগিয়াছে। কৃষ্ণ ফুঁ দিয়া সেই ধূলা বাহির করিয়া দিলেন। তাহাতে এই সমস্ত গোপী এবং অন্য যে সকল আছেন, তাঁহাদের সৌভাগ্য-গর্ব্ব নষ্ট হইল।

সুতরাং এখানে কৃষ্ণ-রাধার প্রেমের কথাই বলা হইল ; কতকটা রাসের কথাও বলা হইল। "এই সকল গোপীর" অর্থাৎ যাহারা কৃষ্ণ-রাধার সম্মুখে ছিল ; ইহা হইতে বোধ হইতেছে, কৃষ্ণ অনেকগুলি গোপী লইয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন, এমন সময় সেখান দিয়া কতকগুলি গরু চলিয়া যায় তাহাতে রাধার চোখে ধূলা পড়ে। কৃষ্ণ আদর করিয়া নিজের মুখে ফুঁ দিয়া সে ধূলা ঝাড়িয়া দেন। তাহাতে 'অন্য গোপীদের' আমি কৃষ্ণের বড় প্রিয়া বলিয়া যে অভিমান ছিল, সে অভিমানটা কাটিয়া যায়। সুতরাং বলিতে হইবে, সেখানে অনেকগুলি গোপী ছিল এবং কৃষ্ণ সকলকে লইয়াই কেলি করিতেছিলেন।

পণ্ডিতেরা বলেন, এ বইখানি ইংরেজী ৬৯ সালের লেখা ; সে সময় হইতেই তাহা হইলে কৃষ্ণরাধার প্রেমের কথা চলিয়া আসিতেছিল এবং বোধ হয়, রাসের কথাও চলিয়া আসিতেছিল। এই সকল কথা ক্রমে ১২ শতক পর্য্যন্ত খুব বিস্তার হইয়া পড়ে। বড়ু চণ্ডীদাস সেগুলিকে জড় করিয়া তাঁহার বই লেখেন এবং বড়ু চণ্ডীদাসের বই হইতে জয়দেব রাস এবং মানের কথা পান।

এতদিন পর্য্যন্ত আমরা জানিতাম, চণ্ডীদাস নামে একজন কবি ছিলেন। তাঁহার বাড়ী নান্নুরে। নান্নুর বীরভূম জেলায়। তিনি কবি ; বামুনের ছেলে। তিনি বাসুলী দেবীর পূজারী। বাসুলী তাঁহাকে বলিয়া যান, তুমি রামী রজকিনীর সহিত প্রেম কর, নহিলে তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে না। রজকিনী মন্দিরের পেটিনী ছিল, অর্থাৎ মন্দির ঝাঁট ঝুঁট দিত।

বিদ্যাপতির সাথে চণ্ডীদাসের দেখা হইয়াছিল। দু'জনেই দু'জনার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যখন তাঁহাদের দেখা হয়,তখন চণ্ডীদাসের বয়স বেশী ; বিদ্যাপতির বয়স অল্প। চৌদ্দ শতকের মাঝখান হইতে পনর শতকের মাঝখান পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের সময়। যাঁহারা চণ্ডীদাসের পদাবলী ছাপাইয়াছেন, তাঁহারা ইহার মধ্যে অনেক কথাই মিছা বলিয়াছিলেন। নীলরতন বাবু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পরস্পরের দেখাশুনার কথা উড়াইয়াই দিয়াছেন। তাঁহার মনের ভাব এই—চণ্ডীদাস ত এ কথা বলেন না, বিদ্যাপতিও এ কথা বলেন না। বলেন, তাঁহাদের চারি শত বৎসর পরের নরহরি দাস ও বৈষ্ণব দাস। সুতরাং উহাতে বিশেষ আস্থা করিবার কোন কারণ নাই। ভুল বলিবার আরও এক বিশেষ কারণ আছে। চণ্ডীদাস যদি বিদ্যাপতির সহিত দেখা করিতে যান,

তিনি পশ্চিম মুখে যাইবেন এবং বিদ্যাপতি পূর্ব্ব-মুখে আসিবেন। তাহা হইলে গঙ্গাতীরে দেখা হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, গঙ্গা নান্নুর হইতে পূবে। সুতরাং ও কথাটা অগ্রাহ্য। নান্নুরে যে চণ্ডীদাসের বাড়ী, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলার বইয়ে সে কথা নাই। নীলরতন বাবু যে চণ্ডীদাসের পদাবলী ছাপাইয়াছেন, তাহাতেও সে কথা নাই; আছে, নীলরতনবাবুর "রাগাত্মিক" পদাবলীর মধ্যে। নীলরতন বাবু সেগুলিকে "রাগাত্মিক" বলিয়াছেন, কিন্তু সেগুলিতে রাগরাগিণীর উল্লেখ নাই। সেগুলিকে কতদূর প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, আমি জানি না। সেগুলির ভাষা, ভাব-ভঙ্গী দেখিলে মনে হয়, বড়ই একেলে। সেগুলিকে যদি অগ্রাহ্য করি, তাহা হইলে এদেশে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রচলিত আছে, তাহার একটীও টিঁকে না। নান্নুরও টিকে না, রামী রজকিনীও টিঁকে না। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন পুঁথিখানার বয়স ১৩০০ হইতে ১৪০০। না হয় এই ১০০ বছরের শেষা-শেষি হইবে। চণ্ডীদাস ১৩৫০ হইতে ১৪৫০ পর্য্যন্ত যদি বাঁচিয়া থাকেন, তবে এই পুথি কি তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল; না, ওখানি তিনি নিজে লিখিয়াছিলেন? পূর্ব্বে লেখা ত সম্ভবই নয়, তাঁহার নিজের হাতের লেখা বলিয়াও ত বোধ হয় না। তার পর আর এক কথা, এক চণ্ডীদাস কৃষ্ণলীলার জন্য ছ'খানা পুস্তক লিখিবেন কেন? একখানা ছাপিয়াছেন বসন্ত বাবু, আর একখানা ছাপিয়াছেন নীলরতন বাবু। একই বিষয়ের বই, অথচ কোথাও কিছু মেলে না কেন? একখানার ভাষা বড়ই পুরাণ, আর একখানার বড়ই নূতন! একখানাতে চণ্ডীদাস আপনাকে বড়ু চণ্ডীদাস বা শুধু চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, আর একখানায় তিনি নিজেকে দ্বিজ চণ্ডীদাসই বলিয়াছেন—কখনও কখনও শুধু চণ্ডীদাসও আছে। এক জায়গায় কবি চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, দশ বার জায়গায় বড়ু চণ্ডীদাসও বলিয়াছেন। কিন্তু আসল বড়ু চণ্ডীদাসের বইএর গানের সঙ্গে একটী গানও মেলে না। ইহার অর্থ কি? চণ্ডীদাস দু'জন না হইলে ইহার সামঞ্জস্য হয় না।

বড়ু চণ্ডীদাসের রাগিণীগুলি সব পুরাণ, তাহার অনেকগুলি "বৌদ্ধগান ও দোহায়" আছে। আবার অনেকগুলি জয়দেবেও আছে। দ্বিজ-চণ্ডীদাসের রাগরাগিণীগুলি প্রায়ই নূতন! দু'চারটী যে পুরাণ নাই, তাহা নহে; কতকগুলি আবার বড়ই বেশী নূতন। ইহারই বা অর্থ কি? দুই জন চণ্ডীদাস স্বীকার না করিলে ইহার সামঞ্জস্য হয় না। ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলেও দু'জন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এক চণ্ডীদাসকে ভাঙ্গিয়া দুই করিতে বাঙ্গালী কি রাজী হইবেন? বড়ু চণ্ডীদাস বলিতেছেন, আমার নাম অনন্ত, দ্বিজ চণ্ডীদাস তাঁহার ৭৬৩ কৃষ্ণলীলার পদে এক জায়গায়ও অনন্তের নাম করেন নাই। বড়ু চণ্ডীদাস আবার কোথাও রামী রজকিনীর নাম করেন নাই। শুধু দু'জনারই; দু'জনেই গান লিখিয়াছেন। একজন কৃষ্ণলীলার জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কতদূর লিখিয়াছেন, বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার জন্মখণ্ডে ও কালিয়দমনখণ্ডে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের কথা নাই। কিন্তু সে প্রেম ছাড়া নীলরতন বাবুর একটী পদও নাই। বড়ু চণ্ডীদাস গানে গানে কৃষ্ণের সব কথাই লিখিয়াছেন। গানের মধ্যে তিনি যে পূতনাবধ করিয়াছিলেন, যমলার্জ্জুন বধ করিয়াছিলেন, শকটাসুর বধ করিয়াছিলেন—সে সব কথা আছে। তিনি যেন গান

সঞ্চয় করিয়া কৃষ্ণের একটী ইতিহাস লিখিয়াছেন। নীলরতন বাবুর বইখানি কতকটা কীর্ত্তনের ছাঁচে ঢালা। তাঁহার চণ্ডীদাস ইতিহাসের কথা বলেন না। কেবল প্রেম, আর কেবল রাধা। এ ভেদ হইবার কারণও বোধ হয়, চণ্ডীদাস দুই জন। একজনের সময় এধরণের কীর্ত্তন আরম্ভ হয় নাই। আর একজনের সময় কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর কিছুদিন পরে জীব গোস্বামী "উজ্জ্বল-নীলমণি" নামে একখানি অলঙ্কারের বই লেখেন, সেই সময় হইতেই রাগ, রস ভাব লইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। বড়ু চণ্ডীদাস ইহার অনেক আগে। তাঁহার পুথিতে রাগ, রস, ভাব লইয়া গান বা পদ সাজাইবার কোন চেষ্টা নাই। যে সব চণ্ডীদাসের পদ নীলরতন বাবু ছাপাইয়াছেন, তাহাতে কতক কতক সে ভাবে সাজাইবার ব্যবস্থা ছিল। নীলরতন বাবু কিন্তু নূতন কীর্ত্তনের ধরণে সেগুলি সাজাইয়াছেন। রসাস্বাদনের পক্ষে বেশ হইয়াছে, কিন্তু ইতিহাসের পক্ষে তাহাতে, একটু মন্দ হইয়াছে। এ চণ্ডীদাসের সময়টা উজ্জ্বল-নীলমণির আগে হইয়াছিল বলিয়া বুঝিতে একটু কষ্ট পাইতে হয়। তিনি যে ভাবে পুথিগুলি পাইয়াছিলেন, সে ভাবে ছাপাইলে বোধ হয়, ইতিহাসকারের পক্ষে একটু সুবিধা হইত।

যদি চণ্ডীদাস দুই হন, তাহা হইলে দু'জনের এক জায়গায় মিল আছে। দু'জনেই বাসুলী দেবীর ভক্ত। বড়ু চণ্ডীদাস বাসুলীকে আয়ী বলিয়াছেন। আয়ী শব্দে তিনি কি বুঝিতেন, জানি না, উহা বোধ হয়, "আর্য্যা" শব্দের অপভ্রংশ। অনেক জায়গায়, মাকে আয়ী বলে। রাজপুতনায় আয়ীপন্থ বলিয়া এক ধর্ম্ম আছে। মালবের স্বাধীন মুসলমান রাজারা যখন মাঁড়ুতে রাজধানী করিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভিখাডাবির ঘরে একটী ছোট সুন্দর মেয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাঁহাকে সকলে আয়ী বলিয়া ডাকিত। আয়ী মানে মা। তিনি যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহার নাম আয়ীপন্থ। বাঙ্গলায় আয়ী বলিতে দিদিমা বুঝায়। অনেক জায়গায় প্রপিতামহীও বুঝায়। চণ্ডীদাস বাসুলীকে কি বলিতেন, জানি না। তিনি আপনাকে বাসুলীর গণ বলিয়াছেন, বাসুলীর গতি বলিয়াছেন, গতি শব্দের অর্থ চেলা। বৌদ্ধদের মধ্যে একথাটা খুব চলিত এবং এখনও চলে। তিনি আরও বলিয়াছেন, তিনি বাসুলীর বরে এই বই লিখিতেছেন। তাঁহার ভণিতার পর গানে আর কৃষ্ণরাধার কথা শুনা যায় না। দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদে ভণিতার পরও চণ্ডীদাস কৃষ্ণকে উপদেশ দেন। তিনি আয়ী, গতি বা গণ, এই সব শব্দ ব্যবহার করেন না। কিন্তু বাসুলীর নাম স্থানে স্থানে করিয়া থাকেন, কিন্তু বড় বেশী নয়। এক বাসুলীর চেলা হইলেও দুইজনের মধ্যে বেশ একটু তফাৎ আছে।

এখন দেখিতে হইবে বাসুলী কে? এতদিন লোকের সংস্কার ছিল, বাসুলী ও বিশালাক্ষী এক। তিনি নিত্যাদেবীর সহচরী। নিত্যাষোড়শী নামে এক দেবী আছেন বৌদ্ধদের। তাঁহার ষোলজন সহচরী ছিল। ষোল জন সহচরী-সুদ্ধ নিত্যার মন্দিরও বাঁকুড়া বা বীরভূম জেলায় আছে। বাসুলী তাঁহার এক সহচরী। কিন্তু তিনি মানুষী, কি দেবী, বুঝা গেল না। তিনি যদি নিত্যার আদেশে চণ্ডীদাসকে একটী চড় মারিয়া থাকেন, তবে তিনি মানুষী। সে কালে বড় বড় মন্দিরে দেবদাসী থাকিত। বাসুলী তাহাও হইতে পারেন। তিনি বিশালাক্ষী নহেন। ধর্ম্মপূজার

বিধিতে ধর্ম্ম ঠাকুরের যত আবরণ-দেবতা আছেন, তাহার মধ্যে একজন আছেন, বিশালাক্ষী। একজন আছেন, বাসুলী। সুতরাং দু'জনে এক হইতে পারেন না। বাসুলীর নমস্কারে তাঁহাকে মঙ্গলচণ্ডী বলা হইয়াছে। মঙ্গলচণ্ডী আমাদের একজন পুরাণ দেবতা। তিনি ব্রাহ্মণের দেবতা নন। বৌদ্ধদের অঞ্চল হইতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে সকল জাতিই পূজা করিতে পারে। প্রতিমায়, পটে, খোলায় খাবরায় তাঁহার পূজা হয়। তিনি কিন্তু খুব প্রাচীন দেবতা। ঢাকার টাউন হলের পাশে এক চণ্ডী দেবীর মূর্ত্তি আছে। উহা লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যের তৃতীয় বৎসরে খোদাই করা হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে রাধিকা চণ্ডীর পূজা করিয়াছেন। বড়ু অনন্ত এই চণ্ডীর চেলা ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম চণ্ডীদাস হইয়াছে, মনে হয়। এক একবার মনে হয়, যেন এই চণ্ডীর দাসেরা সকলেই গান করিয়া বেড়াইতেন এবং সকলেই চণ্ডীদাস বলিত। তাহা না বলিলে বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, কবি চণ্ডিদাস, আদি চণ্ডীদাস—এ সকলের অর্থ হয় না। তাই এক একবার মনে হয়, চণ্ডীর সেবক যাঁরা গান করিয়া বেড়াইতেন, তাঁরাই চণ্ডীদাস হইতেন। সুতরাং অনেক চণ্ডীদাস থাকিতে পারেন। তাহা হইলে কিন্তু সব দিক্ সামঞ্জস্য হয়। বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবের আগে, দ্বিজ চণ্ডীদাস ১৪।১৫ শতকে; তার পরও হয় ত কেহ চণ্ডীদাস ছিলেন। একজন আবার আদি চণ্ডীদাস ছিলেন,অর্থাৎ তিনিই প্রথম চণ্ডীর দাস হইয়া গান করিতে বাহির হন। কিন্তু এক চণ্ডীদাসেই রক্ষা নাই, মেলা চণ্ডীদাস হইলে না জানি কি হইবে! এইরূপ নানা চণ্ডীদাস স্বীকার করিলে আর একটী বিষয়েরও সামঞ্জস্য হয়। ঐ যে গৌড়ের বাদশাহের বাড়ীতে গান করিতে গিয়া একজন চণ্ডীদাস মারা যান, তাঁহারও একটা কিনারা হইতে পারে।

সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় একখানি প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা পাতা পাওয়া যায়। তাহাতে লেখা আছে, চণ্ডীদাস একদিন গৌড়ের বাদশাহের বাড়ী কীর্ত্তন করিতে যান। তাঁহার কীর্ত্তনে সকলেই মুগ্ধ হয়। বাদশাহের এক বেগম এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি গান শুনিবার জন্য চণ্ডীদাসের বাসায় উপস্থিত হন এবং তাঁহার হাবভাবে বোধ হয়, যেন তিনি চণ্ডীদাসের প্রতি আসক্ত হইয়াছেন। বাদশাহ তাঁহাকে বারম্বার নিষেধ করেন, তুমি ওখানে যাইও না। কিন্তু বেগম সাহেব তাহা না শুনিয়া পুনরায় চণ্ডীদাসের কাছে গেলেন। বাদশাহ ইহাতে অত্যন্ত রাগিয়া হুকুম দিলেন, চণ্ডীদাসকে হাতীর পিঠে বাঁধিয়া, হাতী খুব জোরে চালাইয়া দাও। এইরূপে তাহার চিত্র-বধ হউক। ঠিক সেইরূপই করা হইল। হাতীকে খুব জোরে চালান হইল। হাতীর পিঠে কাছি দিয়া চণ্ডীদাস খুব শক্তরূপে বাঁধা ছিলেন। হাতী চলায় কাছির ঘেঁষে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল ও রক্ত পড়িতে আরম্ভ হইল। তিনি মরিয়া গেলেন। হাতীকে অনেক দূর জোরে দৌড় করাইয়া ফিরিয়া আসিয়া মৃত দেহ বাদশাহের সম্মুখে ফেলিয়া দেওয়া হইল। রামী রজকিনী নিকটে দাঁড়াইয়া এই সকল দেখিতেছিল। এমন সময় বাদশাহের বেগম আসিয়া হঠাৎ চণ্ডীদাসের বুকের উপর পড়িলেন এবং দেহত্যাগ করিলেন। রামী রজকিনী বেগম সাহেবকে অত্যন্ত ভাগ্যবতী মনে করিয়া আপনাকে নিন্দা করিতে লাগিল।

এ কথা সত্য কি না, জানা যায় না। সত্য হইলে এক জন চণ্ডীদাস যে বাঙ্গালার স্বাধীন

মুসলমান রাজাদিগের রাজত্বকালে খুব বড় কীর্ত্তনীয়া ছিলেন, সে কথা বিশ্বাস করিতে হয় এবং এ বাদশাহ কে ছিলেন, তাহারও সন্ধান করিতে হয়। প্রথম ইলিয়াশসাহী বাদশাহেরা খাঁটী মুসলমান ছিলেন। তাঁহারা যে কীর্ত্তন শুনিবেন, এ কথা মনে হয় না। রাজা গণেশের বংশধরেরা মুসলমান হইলেও তাঁহাদের কীর্ত্তন শুনার প্রবৃত্তি থাকিতে পারে। রাজা গণেশের পুত্র যদু মুসলমান হইয়া জেলাল উদ্দিন নাম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার পৌত্র মহম্মদ শা কয়েক বৎসর বাঙ্গালায় বাদসাহী করেন। ইহাদের কাহারও রাণী বা বেগম কীর্ত্তন শুনিয়া ভুলিতে পারেন। তাহা হইলে চৌদ্দ শতকের শেষ অর্দ্ধেক হইতে ১৫ শতকের প্রথম অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত একজন কীর্ত্তনীয়া চণ্ডীদাস ছিলেন, স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে দ্বিজ চণ্ডীদাস এই সময়ের লোক বলিয়া মনে করিতে হয়। তিনি রামী রজকিনীকে আপনার নির্ব্বাণ লাভের সঙ্গিনী করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি নীচ সংসর্গে মিশিয়াছি।

তাহা হইলে মোট মীমাংসা হইল, বড়ু চণ্ডীদাস লক্ষ্মণ সেনের সময়ে তাঁহার বই লেখেন এবং জয়দেব তাঁহারই বই হইতে অনেক ভাব ও কথা লইয়াছিলেন। আর দ্বিজ চণ্ডীদাস কেবল গান করিয়া বেড়াইতেন, খেয়ালমত গান বাঁধিতেন—রীতিমত কোন বই লিখিয়া যান নাই।

এখন ভাষা দেখিতে হইবে। কবি কৃত্তিবাস ১৪০০ হইতে ১৫০০ এর মাঝখানে রামায়ণ লেখেন। জয়গোপালের হস্ত হইতে সে রামায়ণখানি রক্ষা করিয়া প্রাচীন হাতে লেখা পুথি দেখিয়া হীরেন্দ্রবাবু তাহার অযোধ্যাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড ছাপাইয়াছেন। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতও এই সময়ের লেখা। এই মহাভারত, রামায়ণ ও চণ্ডীদাসের গানের ভাষা আপাতদৃষ্টিতে এক বলিয়াই বোধ হয়। যা ভেদ দেশভেদে। চণ্ডীদাসের বাড়ী পশ্চিমবঙ্গে, কৃত্তিবাসের বাড়ী শান্তিপুরের নিকট, বিজয় পণ্ডিতের বাড়ী ফরিদপুর বা বরিশালে। দেশভেদে যেটুকু ভেদ হয়, ততটুকু ভেদই আছে। 'আপাতদৃষ্টিতে' শব্দ ব্যবহার করিলাম, কারণ, এই সকল পুস্তকের দুরূহ পদসমূহের স্থচি নির্ম্মাণ করিয়া বা ইহাদের ব্যাকরণ-ঘটিত ব্যাপারের তুলনা করিয়া দেখি নাই, দেখিবার সময়ও নাই। যদি কেহ দেখাইয়া দিতে পারেন, অত্যন্ত বাধিত হইব এবং তাহার ফল যদি চণ্ডীদাসকে অধিক প্রাচীন বা অধিক নবীন করিয়া তুলে, তাহতে কিছুমাত্র দুঃখিত হইব না।

বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষা কিন্তু বৌদ্ধগান ও দোহার ভাষার মতই। তবে দেশভেদে ও কালভেদে যতটুকু তফাৎ হইবার, তাহা হইয়াছে। তিনি ঐ সকল দোহা ও গান হইতে যে কেবল অনেক ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নহে, অনেক কথাও লইয়াছেন। তাহা ধরিয়া দেওয়া বিশেষ কঠিন নহে। বৌদ্ধগানের মধ্যে চাটিলের নামটী সকলের চেয়ে নূতন। কারণ, চাটিলের নাম আমরা আর কোথাও পাই নাই। সিদ্ধপুরুষদের নামের ফর্দ্দেও পাই নাই। তেঙ্গুরের ক্যাটেলগেও পাই নাই। বর্ণনরত্নাকরেও পাই নাই। তাঁহার গানের সঙ্গে বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষার বেশ মিল আছে। কাহ্নুপাদের ভাষার সঙ্গেও অনেকটা মিল আছে। তবে কাহ্নুপাদের বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে, চাটিলের বাড়ী বোধ হয়, পশ্চিমবঙ্গেই হইবে। সুতরাং বড়ু ও দ্বিজ চণ্ডীদাস দু'জন হইয়া দাঁড়াইতেছেন।

এতক্ষণ আমরা যাহা বলিতেছিলাম, তাহাতে সহজিয়া ভাবের একেবারেই উল্লেখ করি নাই—

কেবল কৃষ্ণলীলার কথাই বলিয়াছি। কিন্তু কৃষ্ণলীলাটী যে হিন্দুর সহজিয়া ভাব, সে কথাটী আমি অনেক জায়গায় বলিয়াছি। সহজিয়ারা যে জিনিষটী নিজের দেহের উপর লইয়া আসে, হিন্দুরা সেটা কৃষ্ণের উপর অর্পণ করেন। হিন্দুরা দেবতা মানেন। বৌদ্ধেরা মানেন না। তাহারা গুরু মানেন এবং গুরু হইবার চেষ্টা করেন। হিন্দুরা দেবতার সালোক্য ও সাযুজ্য পাইতে চান। দেবতা হইতে চানও না, পারেনও না। সুতরাং সহজিয়ারা যে মহাসুখ আপনি উপভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, হিন্দুরা সেই মহাসুখে কৃষ্ণরাধাকে মগ্ন দেখিয়াই তৃপ্ত হইয়া থাকেন। আপনাকে সে সুখের অধিকারী বলিয়াই মনে করেন না শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা সিংহাসনে নিত্য বিহার করিতেছেন। আট জন নিত্যসখী তাঁহাদের বিহারের উপকরণ জোগাইতেছে। আমরা সেই সখীদের সখী হইয়া কৃষ্ণরাধার মহাসুখের প্রতিভাস দেখিতে পাইব এবং তাঁহাদের সেবায় রত থাকিব অর্থাৎ নিত্যসখীদের নিকট উপকরণ যোগাইয়া দিব, এই তাঁহাদের চরম উদ্দেশ্য। কিন্তু বৌদ্ধ সহজিয়াদিগের উদ্দেশ্য আর একরূপ। তাঁহারা নিজেই নিরাত্মা দেবীর ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন এবং অনন্তকাল তাঁহার সহিত মিশিয়া এক হইয়া থাকিবেন; দুই একেবারেই থাকিবে না। বৌদ্ধদিগের অধিকাংশ চর্য্যাপদেরই উদ্দেশ্য এই। বড়ু চণ্ডীদাস ও জয়দেব কৃষ্ণ রাধিকার উপর সেই জিনিষটী অর্পণ করিয়া হিন্দুদিগকে সহজিয়া করিয়া তুলিয়াছিলেন। বড়ু চণ্ডীদাসের বাড়ী কোথায় ছিল, জানা যায় না, কিন্তু জয়দেবের বাড়ী কেন্দুলী ছিল। কেন্দুলী অজয় নদীর ধারে। সেনপাহাড়ী অর্থাৎ সেন রাজাদিগের প্রাচীন রাজধানী হইতে বেশী দূরে নয়। সহজিয়ারা আজিও দলে দলে পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে জয়দেবের ঘাটে স্নান করিতে আসে এবং প্রতি বৎসর ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাগম হয়। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলে বলে, উনিও ত আমাদের গুরু। আগে বোধ হয়, শুদ্ধ হিন্দু সহজিয়ারাই কেন্দুলীতে আসিত। বৌদ্ধেরা আসিত না। কিন্তু বৌদ্ধেরা এখন আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছে; মনে করে, আমরাও হিন্দু এবং কেন্দুলীতে বছর বছর আসা তাহাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু একটু বেশী পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেই তাহারা বলে,আমরা দেবতা মানি না। আমরা চৈতন্যকে মহাপুরুষ বলিয়া মানি, কৃষ্ণকেও মহাপুরুষ বলিয়া মানি। আমাদের দেবতা, আমাদের সাধন ভজন এই দেহে। তাহারা কেন্দুলীতেই যায়, চৈতন্যসম্প্রদায়ের আর কোন তীর্থস্থানে বড় একটা যায় না। কিন্তু হিন্দু সহজিয়ারা সকলেই কৃষ্ণকীর্ত্তন করে। অনেকে কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে করিতে শেষে খাঁটি সহজিয়া হইয়া যায়। দ্বিজ চণ্ডীদাস বোধ হয়, কৃষ্ণকীর্ত্তন ছাড়িয়া শেষে পাকা সহজিয়া হইয়া গিয়াছিলেন। কারণ, নীলরতন বাবু কৃষ্ণলীলার ৭৬৩ পদের পর রাগরাগিণীশূন্য যে কতকগুলি "রাগাত্মিক" পদ দিয়াছেন, তাহা পুরা সহজিয়া। সেই জন্যই বোধ হয়, গৌড়ের বাদশাহের বেগম সাহেব—হয় ত তিনি কোন সহজিয়া ঘরেরই মেয়ে হইবেন—দ্বিজ চণ্ডীদাসের প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধ-মূর্ত্তি *

কয়েক মাস পূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে যে তিনটি পিত্তল-মূর্ত্তি আনিয়া পরিষৎ-চিত্রশালায় রক্ষা করিবার জন্য উপহার দিয়াছেন, তন্মধ্যে অদ্যকার আলোচ্য মূর্ত্তিটিই উল্লেখযোগ্য। এ তিনটির এইটিকেই প্রাচীনতম বলিয়া বোধ হয়; মূর্ত্তিবিদ্যা হিসাবে ইহার মূল্যও যথেষ্ট। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কোনটিই তেমন প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। এগুলি আধুনিক।

মূর্ত্তিটির স্বরূপ-নির্ণয় সম্বন্ধে কেহ কেহ নাকি বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমি মূর্ত্তি-বিদ্যা সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে ইহাকে মহাকাল ভিন্ন অন্য কোন মূর্ত্তি বলিয়া স্থির করিতে পারি নাই।

মূর্ত্তিটির স্বরূপ-নির্ণয়

এই মূর্ত্তিটি এত সাধারণ শ্রেণীর মহাকাল যে, পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহার তিব্বতীয় অভিধানে মহাকাল বুঝাইতে,এই শ্রেণীর মহাকালের বর্ণনাযুক্ত সংজ্ঞাটি ব্যবহার করিয়াছেন, অর্থাৎ—

গোন্‌পো ছক্ ঠুক্ পা (Mgon-po phyag-drug-pa)

Mgon-po = নাথ; phyag-drugpa = ছয় হাতযুক্ত।

জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম যে. শাস্ত্রী মহাশয় আগামী এপ্রিল মাসের পূর্ব্বে তাঁহার প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন না। ততদিন অপেক্ষা না করিয়া, এ সম্বন্ধে একটু-আধটু আলোচনা করা অবৈধ নহে বিবেচনা করিয়া এবং আপনাদের চিত্রশালাধ্যক্ষ-হিসাবে আমার মন্তব্যটি পূর্ব্বেই প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিলাম। আমিও তাঁহার মতামত জানিবার জন্য সোৎসুক অপেক্ষা করিব।

মূর্ত্তিটির স্বরূপ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ইহার লক্ষণ-গুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাউক। ইহা ষড়ভুজ, দ্বিপদ এবং একশীর্ষ; গণেশমূর্ত্তির উপর দণ্ডায়মান, ত্রিনয়ন, বৃত্তোগ্রলোচন, ঊর্দ্ধকেশ, সর্পভূষণ, ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিত, জ্বালামণ্ডলাবৃত, দ্রংষ্ট্রাকরাল, শ্মশ্রু-গুম্ফ-শোভিত। ছয়টি হস্তে যে প্রহরণ বা লাঞ্ছনগুলি বিদ্যমান, তাহাদের যথাক্রমে উল্লেখ করা যাইতেছে।—

মূর্ত্তিটির লক্ষণ

দক্ষিণহস্ত—ডমরু, অঙ্কুশ, কর্ত্তরী; বামহস্ত—নরকপালযুক্ত ত্রিশূল, পাশ, নরকপাল।

মূর্ত্তিটির গলদেশে হৃদয়াকৃতি নরমুণ্ডমালা লম্বমান, দক্ষিণ জানুর উপর ব্যাঘ্রমস্তক বিদ্যমান; এই বাঘের চর্ম্মই মহাকাল পরিধান করিয়া আছেন; জ্বালামণ্ডলের নিম্নে ৫০টি মুণ্ডে গঠিত মাল্য শোভমান। মস্তকে পঞ্চ-কপাল ও পঞ্চশীর্ষ মুকুট রহিয়াছে। শেষোক্ত দুইটি লাঞ্ছন

---

* ১৩২৯।৩০শে পৌষ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

মূর্ত্তিটির স্বরূপ-দ্যোতক হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার কথা ক্রমশঃ বলিব। পদগ্রন্থি ও মণিবন্ধে সর্প, নূপুর ও সর্পবলয়, গলদেশে সর্পহার। পদদেশে বিরাজমান গণেশমূর্ত্তির দুই হস্ত—দক্ষিণ হস্ত অভয়মুদ্রাযুক্ত, বামহস্তে লড্ডুক রহিয়াছে; এ মূর্ত্তির মুকুটও পঞ্চশীর্ষযুক্ত।

একখানি আধুনিক নেপালী পুথিতে মহাকালের এক বর্ণনা পাইয়াছি; ইহার সহিত আমাদের আলোচ্য মূর্ত্তিটির বিশেষ মিল আছে। পুথিটির নাম ধর্ম্মকোষসংগ্রহ। ইহার কথা ক্রমশঃ বলিব। বর্ণনাটি অতি সরল সংস্কৃতে লিখিত; ইহা এই—"একবক্ত্র-নীলাঞ্জনবর্ণ-ভৃকুটিকরালঃ বর্ত্তুলস্ত্রিনয়নঃ। পিঙ্গলনয়নয়োর্দ্ধকেশঃ ললৎজিহ্ব দংষ্ট্রাকরালঃ ব্যাত্তাননঃ রক্তশ্মশ্রুল নবনাগালঙ্কৃতসর্ব্বাঙ্গঃ মুণ্ডমালাবিভূষিতঃ চতুর্ভুজঃ প্রথমসব্যহস্তে ন্যস্তাধঃপ্রদেশঃ করতিং দ্বিতীয়েনাকুঞ্চিতেন ডমরুং বাদয়ন্ মারান্ ত্রাসয়ন্। প্রথমবামে করোটকং পঞ্চামিষপূর্ণং। দ্বিতীয়েন দ্বিমুণ্ডযুক্তখট্টাঙ্গং দধানঃ বেতালোপরিপ্রত্যালীঢ়ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরঃ তস্য নামো মহাকাল মহাবীরঃ। মহান্তং কলয়তি ইতি মহাকালঃ। মহাংশ্চাসৌ কালো বা। কারণং মারদর্পসংহরণার্থং নীলবর্ণেনাক্ষোভ্যেন সৃষ্টো যো মহাকালঃ॥ মহান্ কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ যস্য সঃ মহাকালঃ। মহান্তং কালং কলয়তি চ চতুর্যুগাদি কালসময়ং ত্র——সময়ং কলয়তি বিচারয়তি ইতি মহাকালঃ। মারাদিদুষ্টজনত্রাসনার্থং বুদ্ধশাসনরক্ষণে ভয়ঙ্করমূর্ত্তিঃ ত্রিভুবনস্থান্ বুদ্ধদ্রোহিণঃ ত্রাসয়িতুম্ বর্ত্তুলভীমত্রিনয়নঃ এবং সর্ব্বাঙ্গাবয়বানি ভীমানি যস্য ত্রাসনার্থং পালনার্থং মৌলৌ অক্ষোভ্যঃ যস্য মহাকারুণিকঃ। অথচ যে যে বুদ্ধ-নিন্দকাস্তান্ অনেন ছেৎস্যামি ইতি করতিং আদধানঃ।" ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও বর্ণিত আছে যে, বুদ্ধনিন্দকদের রক্তপান করিবার জন্য হস্তে করোটক; শব্দদ্বারা বুদ্ধ-নিন্দকদের বধির করেন বলিয়া হস্তে ডমরু।*

ধর্ম্মকোষসংগ্রহ ও মহাকাল বর্ণনা

পূর্ব্বোক্ত বর্ণনাটি স্বয়ম্ভূপুরাণ হইতে গৃহীত। নেপালী পুথিতে যেমন মহাকালকে বুদ্ধধর্ম্ম বা বুদ্ধশাসনরক্ষয়িতা অভিহিত করা হইয়াছে, তিব্বতীয় সাধনা-গ্রন্থেও এইরূপ বলা হইয়াছে। সে কথা ক্রমশঃ বলিব।

নেপালী পুথি ও তিব্বতীয় সাধনা-গ্রন্থ

শিল্পের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে মূর্ত্তিটির মধ্যে বিশেষ কিছুই নাই; ইহাতে বিভিন্ন মুদ্রাও তেমন দৃষ্ট হয় না। যে যে হস্তে ডমরু, অঙ্কুশ, ত্রিশূল ও পাশ রহিয়াছে, তাহার সকলগুলিই "কর্ত্তরীহস্তমুদ্রা"-জ্ঞাপক। যে হস্তে অঙ্কুশ রহিয়াছে, তাহার তর্জ্জনীটি আর একটু বক্র হইলে সিংহকর্ণ মুদ্রা হইয়া যাইত। যে হস্তে কর্ত্তরী, তাহা "কটকহস্তমুদ্রা"-দ্যোতক; যে হস্তে কপাল রহিয়াছে, তাহা দেখিতে বিপর্য্যস্ত কর্ত্তরী-মুদ্রার ন্যায়; ইহার নাম "গ্রহণহস্ত"। দাক্ষিণাত্যে পুরোহিতদিগকে এই সংজ্ঞা ব্যবহার করিতে শুনিয়াছি, ইহার পরিভাষা জ্ঞাত নহি। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার South-Indian Bronzes পুস্তকের L চিত্রে এইরূপ

শিল্পের দিক্ হইতে মূর্ত্তিটির পরিচয়

---

* আদর্শ পুথির বানান ও পাঠের কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা হয় নাই।—লেখক।

হস্তকে "গলীন হস্ত" বলিয়াছেন, তিনি স্বয়ং এই পরিভাষায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; ইহা "গলীন হস্ত" নামের পার্শ্বস্থিত জিজ্ঞাসার চিহ্ন দেখিয়া বোধ হয়। কোন শিল্প-শাস্ত্রে যে এ নাম পাইয়াছেন, তাহারও তিনি উল্লেখ করেন নাই।

মহাকালের পদস্থিত গণেশমূর্ত্তির দক্ষিণহস্ত অভয়মুদ্রা-জ্ঞাপক। এই হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলিদ্বয় যে সম্মুখে হেলিয়া আসিয়াছে, তাহা ভারতীয় শিল্পরীত্যনুসারে; বামহস্তটি কোন মুদ্রাজ্ঞাপক নহে; শিল্পশাস্ত্রীয় গ্রহণমুদ্রাজ্ঞাপক যে চিরন্তন রীতি রহিয়াছে, ইহা তাহা হইতে একেবারে স্বতন্ত্র; হস্তটি স্বাভাবিক ধরিবার রীতিতে গঠিত।

মহাকালের পদস্থিত গণেশমূর্ত্তি

মূর্ত্তিটির দাঁড়াইবার ভঙ্গিটি উল্লেখযোগ্য; দুইটি পদদেশের মধ্যে ব্যবধান রহিয়াছে। এ মুদ্রার নাম প্রত্যালীঢ় মুদ্রা। দক্ষিণ পদ বাম পদ অপেক্ষা উচ্চে অবস্থিত, দক্ষিণ জানুও এই কারণে বাম জানু অপেক্ষা উন্নীত। কিন্তু তাহা বলিয়া দেহযষ্টিতে কোন "ভঙ্গ" ভাব দেখা যায় না। মুখটি বামে ঈষৎ হেলিয়াছে।

মূর্ত্তিটির দাঁড়াইবার ভঙ্গি

মূর্ত্তিটি তেমন অলঙ্কার-ভূষিত নহে; অলঙ্কারের মধ্যে সর্প, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, হৃদয়াকৃতি মুণ্ডমালা, পঞ্চনৃকপাল ও পঞ্চরত্নযুক্ত শিরোবন্ধ। সর্পই কর্ণকুণ্ডলরূপে বিরাজমান, সাধারণতঃ দৃষ্ট কটিবন্ধও নাই। পঞ্চমুণ্ড পঞ্চধ্যানী বুদ্ধনির্দ্দেশক ও পঞ্চশীর্ষ বা পঞ্চরত্নযুক্ত মুকুটটি অক্ষোভ্যের মুদ্রাজ্ঞাপক। প্রায়শঃ এইরূপ মূর্ত্তির মস্তকে অক্ষোভ্যের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। এ স্থলে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এ হিসাবে ইহার একটু বিশিষ্টতা আছে। মূর্ত্তিটির ঊর্দ্ধকেশাবলি বেশ মনোজ্ঞ; ইহারা জ্বালাদ্যোতক। হস্তে ধৃত প্রহরণগুলির মধ্যে অল্পবিস্তর বৈচিত্র্য আছে। দক্ষিণ হস্তে ধৃত কর্ত্তরী তিব্বতীয় আদর্শে কল্পিত। ডমরুটির ধরিবার দণ্ড দুইটি। কোন কোন ডমরু সর্পজড়িত থাকে। ইহাতে তাহা নাই। ত্রিশূলের দণ্ডে সর্প জড়াইয়া আছে।

মূর্ত্তিটির অলঙ্কার ও প্রহরণ

এ মূর্ত্তিটির আর একটি বৈচিত্র্য এই যে, গণেশমূর্ত্তিটি শয়ান নহে। তিব্বতীয় অনেক মূর্ত্তিতেই শয়ান অবস্থায় গণেশ দৃষ্ট হয়। শুদ্ধ গণেশ নহে, তাঁহার শক্তিও তাঁহার সহিত শয়ানা থাকেন। তেঞ্জুর তান্ত্রিক অংশের ৮৩ খণ্ড হইতে শবরিকৃত গুহ্যসাধনা হইতে মহাকালের চক্র বা সাধনা বর্ণনা করিবার সময় ইহার উল্লেখ করিব।

গণেশমূর্ত্তি সম্বন্ধে বিশিষ্টতা

আরও একটি কথা এ স্থলে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি এবং এ হিসাবে মূর্ত্তিটিকে বৈচিত্র্য-যুক্ত বলিতে হইবে। সাধারণতঃ মহাকালমূর্ত্তি সশক্তি দৃষ্ট হয়। মূর্ত্তিটির সম্মুখদেশে মুখোমুখী আলিঙ্গনবদ্ধা শক্তির মূর্ত্তি মহাকালের সহিত দৃষ্ট হয়; এ স্থলে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। সশক্তি মহাকাল, শক্তিহীন মহাকাল অপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর। সশক্তি মহাকালের যে সাধন করিতে হয়, তাহা 'গুহ্যসাধনা' বর্ণনা করিবার সময় বলিব। মহাকালের শক্তির নাম গুহ্যজ্ঞানা।

শক্তি হিসাবে বিশিষ্টতা

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিন মূর্ত্তিভেদের নিয়মানুসারে আমাদের আলোচ্য মূর্ত্তিটি দ্বিতীয় শ্রেণীর, অর্থাৎ রাজসিক শ্রেণীর অন্তর্গত। আমি সাত্ত্বিক শ্রেণীর মহাকাল-মূর্ত্তি দেখি নাই, কিন্তু থাকা অসম্ভব নহে। ইহার রাজসী ও তামসী মূর্ত্তিরই প্রচলন অধিক। ঠিক শিল্পশাস্ত্রের নিয়মানুসারে ইহাকে রাজসিক মূর্ত্তিও বলা চলে না। ইহাতে বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই; কেন না, শিল্পী কোন কালেই শিল্পশাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া আপন মূর্ত্তি কল্পনা করেন নাই। ইহা আমি পেশোয়ার, কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া সেতুবন্ধরামেশ্বর পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া বুঝিয়াছি। ইহাতে এক প্রকার ভালই হইয়াছে; কেন না, শাস্ত্রের এই নিগড়বদ্ধ নিয়ম ব্যত্যয় শিল্পে সজীবতা ও প্রাণস্পন্দনের সূচনা করিয়া শুদ্ধ যে দেশের শিল্পধারাকে রক্ষা করে, এমন নহে, জাতিটিকেও বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক হিসাবে মূর্ত্তিভেদ

প্রকৃত প্রস্তাবে মহাকালের রাজসিক মূর্ত্তিই হইতে পারে না। কেন না, রাজসিক মূর্ত্তির বর্ণ লোহিত এবং তামসিক মূর্ত্তির বর্ণ কৃষ্ণ। আমরা দেখিয়াছি যে, মহাকালের বর্ণ নীলাঞ্জনের ন্যায়। স্বয়ম্ভূপুরাণধৃত ধর্ম্মকোষসংগ্রহ নামক আধুনিক নেপালী পুথিতে মহাকালের বর্ণনায় আছে,—'একবক্ত্রং, নীলাঞ্জনবর্ণ ভৃকুটিকরাল. বর্ত্তুলত্রিনয়নঃ'।

মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম ও তৎসংক্রান্ত মূর্ত্তি-বিদ্যা যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, মহাকাল বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্ব নহেন। তবে ইনি কি? ইনি ধর্ম্মপালদিগের অন্তত্তম। কথাটা এখনও পরিস্ফুট হইল না। ধর্ম্মপাল অর্থ লইয়া অনেক কথা আছে। ধর্ম্মপালের অর্থ, যিনি ধর্ম্ম রক্ষা বা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম রক্ষা করেন। ধর্ম্মপাল পূজা দ্বারা নির্ব্বাণ লাভ হয় না; ইঁহার দ্বারা ধর্ম্মের রক্ষাই হয়। মহাযানশাখান্তর্গত বৌদ্ধ তান্ত্রিক শাস্ত্র-মতে বা বজ্রযান বা অতিমহাযান শাস্ত্রানুসারে আমাদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি এই ধর্ম্মপাল-শ্রেণীর অন্তর্গত। এই ভাবটি হীনযানপন্থীরাও গ্রহণ করিয়াছেন, দেখা যায়। কলিকাতাস্থ মহাধর্ম্মরাজশ্রী বিহারে বিষ্ণুর চিত্র বিহারের রক্ষাকর্ত্তা হিসাবে রক্ষিত আছে। হীনযান-সম্প্রদায়ে এ ভাবটি গৃহীত হইলেও, তাঁহাদের কোন সূত্র বা পিটক গ্রন্থে এ শব্দের ব্যবহার দেখি নাই। Childers' Pali Dictionary গ্রন্থেও এ ভাবাত্মক কোন শব্দ নয়নগোচর হয় নাই।

মহাকাল বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্ব নহেন, ইনি ধর্ম্মপালবিশেষ

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আমি শ্রীজ্ঞানানন্দ পরমহংস-বিরচিত কৌলাবলীতন্ত্রের বীরসাধন-বিষয়ক চতুর্দ্দশ উল্লাসে ধর্ম্মপাল শব্দের উল্লেখ পাইয়াছি। আরও কয়েকটি তন্ত্রে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া কোথাও এ শব্দের উল্লেখ পাই নাই। ব্রাহ্মণ্য মূর্ত্তিবিদ্যা-বিষয়ক কোন স্বদেশী বা বিদেশী পণ্ডিতের গ্রন্থেও এ শব্দের প্রয়োগ দেখি নাই। কৌলাবলী তন্ত্রোক্ত মহাকালবিষয়ক পদটি এই:—'শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্ম্মপাল নমোঽস্তু তে।' শ্রীগর্ভ কোন্ দেবতা, জ্ঞাত নহি, বিজয় একাদশ রুদ্রের অন্ততম। মৎকর্তৃক উদ্ধৃত এই তন্ত্রোক্ত পদটি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও মূর্ত্তিবিদ্যার তুলনামূলক আলোচনার পথ অনেকটা সুগম করিবে, আশা করি।

ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রে ধর্ম্মপালের উল্লেখ